২ জানুয়ারি ২০০৮ • দশ টাকা

আনন্দমেলা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদার গল্পের জমজমাট সম্পূর্ণ কমিক্‌স

মৎস্যপুরাণ



রোমাঞ্চকর সম্পূর্ণ উপন্যাসের শেষাংশ

প্রতাপগড়ের আততায়ী

চারটি দুর্দান্ত গল্প

ক্রিকেটের সফল 'পরীক্ষার্থী' সৌরভ

কার্তিকেয়নের কীর্তি

খেলাধুলোয় ফেলে আসা ২০০৭



পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি, স্ক্যান ও এডিট : স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : dhulokhela@gmail.com


আয়ুর্বেদ মতে
ঠাণ্ডা-গরমে -
ঋতু পরিবর্তনে
সর্দি কাশির উপশমে
দুলালের®
তালমিছরি
আজও সত্যিই ধন্বন্তরী।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে
দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট।
আর সর্দি - কাশি বেশী হলে
একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ
দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে
ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার
খান - দারুণ কাজ দেবে।
Regd. Trade Mark
দুলালের
তালমিছরি
3D হলোগ্রাম স্টিকারটি
দেখে নেবেন
PRASA-07
দুলালের®
তালমিছরি
সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
ভারত সরকারের
R
® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

আনন্দমেলা

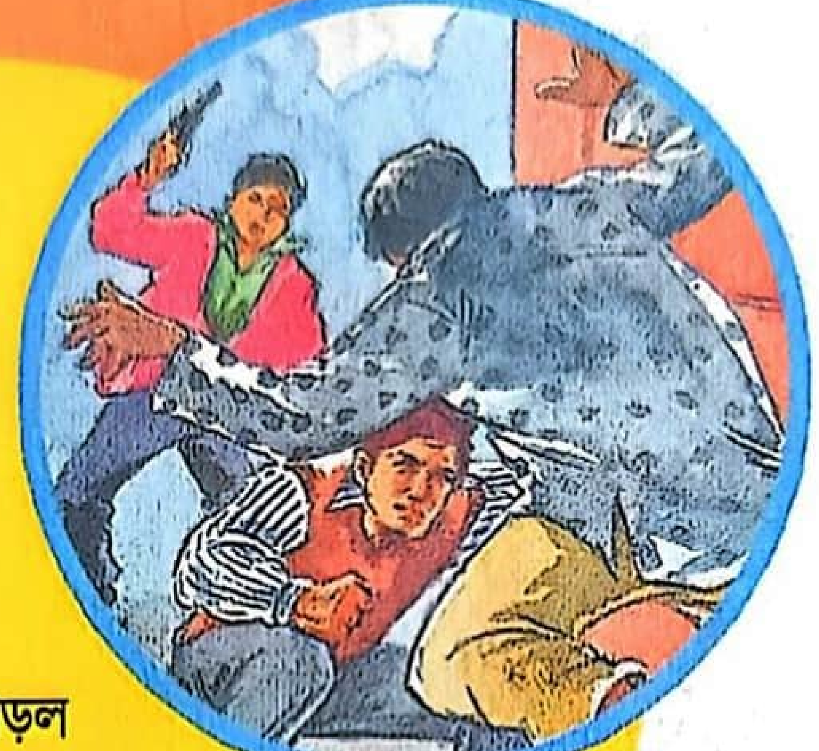
৩৩ বর্ষ ৯ সংখ্যা ২ জানুয়ারি ২০০৮ ১৭ পৌষ ১৪১৪



মজাদার সম্পূর্ণ কমিক্‌স

মৎস্যপুরাণ ১৬

কাহিনি: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
প্যালা সবে ম্যালেরিয়া থেকে উঠেছে। তার খাইখাই ভাবটা এখন যেন আরও বেড়ে গিয়েছে। 'বঙ্গেশ্বরী মিষ্টান্ন ভান্ডার'-এ গিয়ে রাজভোগ খাচ্ছে। এমন সময় টেনিদা এসে হাজির। চটপট টেনিদা চারটে রাজভোগের অর্ডার দিল। তারপর এক ফাঁকে প্যালা সটকে পড়ার তাল করতেই ধরে ফেলল টেনিদা। প্যালাকে নিয়ে চলল দমদমায়। কেন? কী ঘটল সেখানে?
ছবি: অরিজিৎ দত্তচৌধুরী



রোমাঞ্চকর সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)

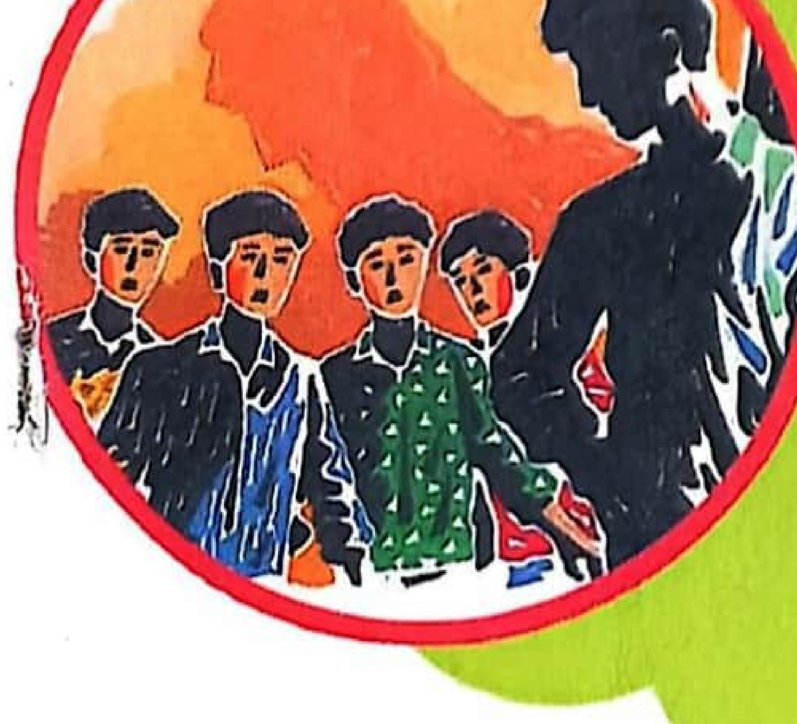
প্রতাপগড়ের আততায়ী ৩৪

অনির্বাণ বসু

ক্যামাক স্ট্রিটের শান্তি আবাসের খুনের ঘটনায় তদন্তে নেমে পড়ল আকিদারা। খুন হয়েছেন অজয়কিশোর শর্মা নামে এক ভদ্রলোক। খুব কাছ থেকে তাঁকে গুলি করা হয়েছে। বিদ্যাধর মেহেতার ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়েছিলেন তিনি। এখন পোস্টমর্টেম রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা। কী হল তারপর? প্রকৃত দোষী কে?



খেলাধুলো



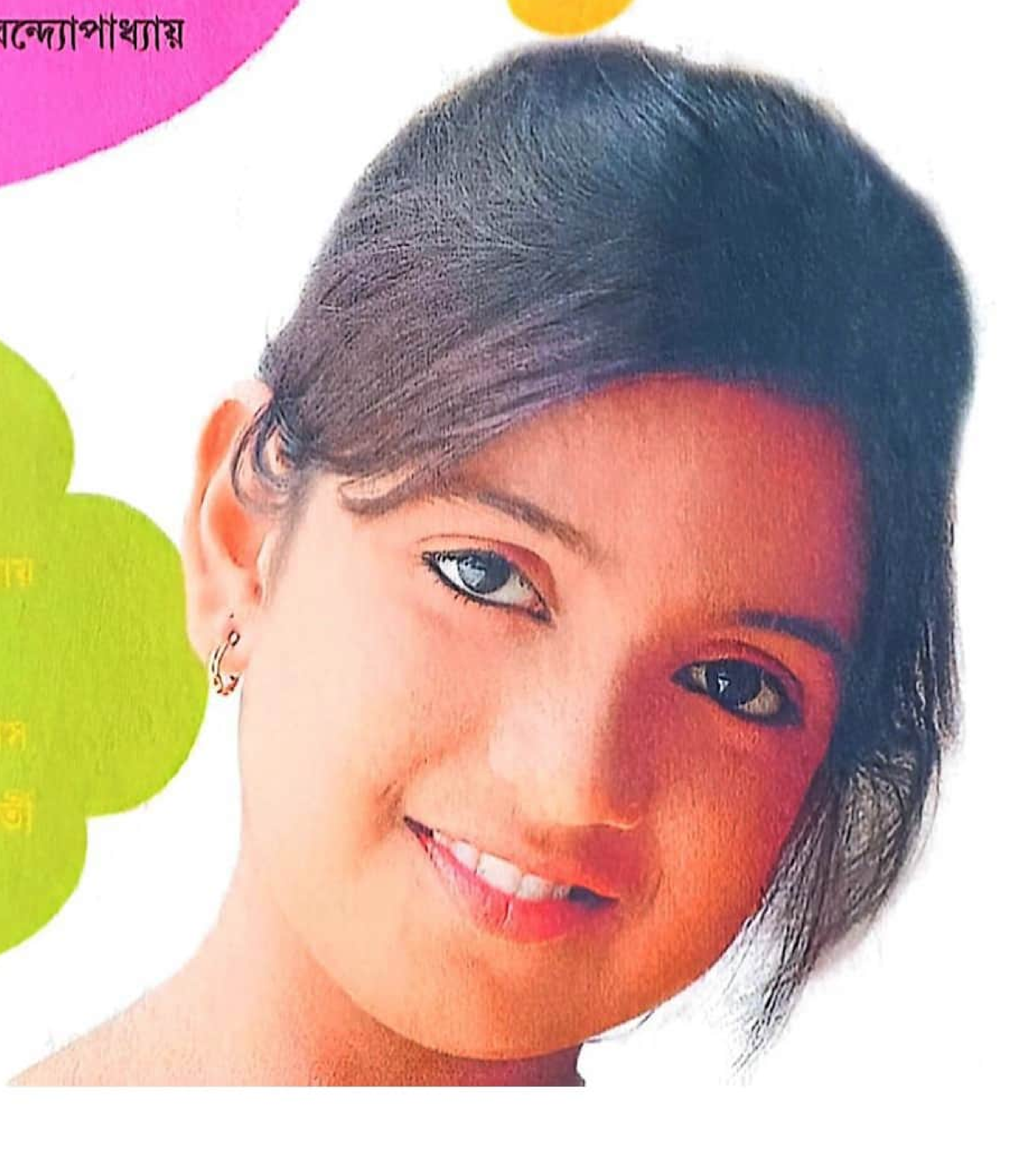
চারটি দুর্দান্ত গল্প

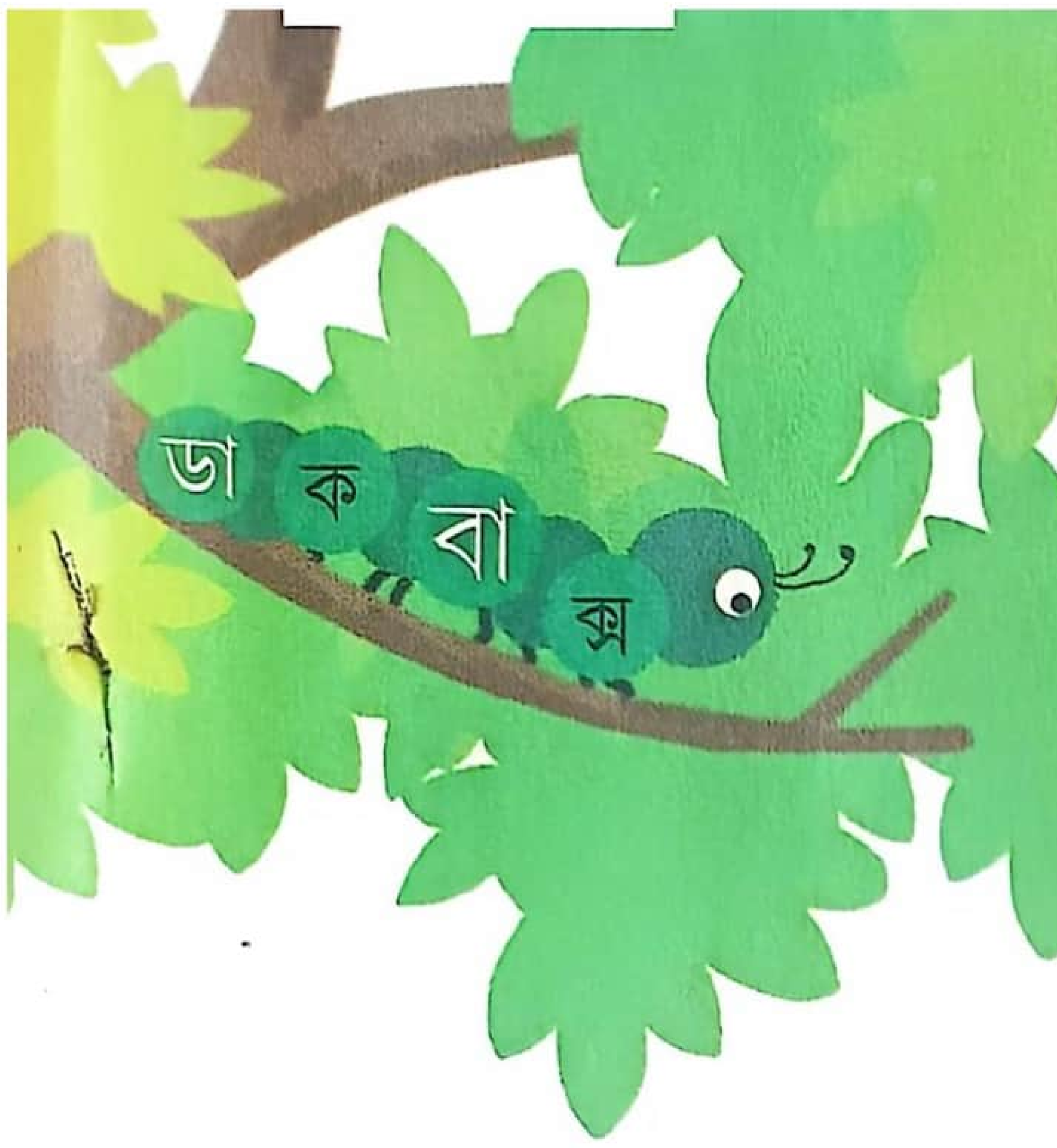
অন্যান্য পাতায়

প্রচ্ছদ: অরিজিৎ দত্তচৌধুরী

সম্পাদক: পৌলোমী সেনগুপ্ত

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।





ডিসেম্বর সংখ্যায় ‘প্রতাপগড়ের আততায়ী’, ‘নন্দনবনের সেই রাত’ এবং ‘পাসওয়ার্ড’ গল্পগুলো ভাল লেগেছে।

অভিরূপ ভট্টাচার্য

ষষ্ঠ শ্রেণি, ভাটপাড়া হাই স্কুল, হুগলি

এই সংখ্যা আরও যাদের ভাল লেগেছে: অরুণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, *নবম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল;* অভিষেক ভট্টাচার্য, *নবম শ্রেণি, অমরকৃষ্ণ পাঠশালা, ভাটপাড়া;* অর্ণব রাহা, *অষ্টম শ্রেণি, নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়;* ময়ূখ ভট্টাচার্য, *সপ্তম শ্রেণি, চিলড্রেন্স ওন হোম, হুগলি*

ভাল লেগেছে ডিসেম্বর সংখ্যা

‘আনন্দমেলা’র ডিসেম্বর সংখ্যাটি খুবই ভাল লেগেছে। আবার রাপ্পা রায়কে ফিরে পেয়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। তা ছাড়া ‘পাসওয়ার্ড’ এবং ‘নন্দনবনের সেই রাত’ গল্প দু’টি দারুণ। পৃথিবীর লুপ্ত প্রাণীদের সম্পর্কে তথ্য এবং স্পাইডারম্যান নিয়ে কমিক্‌স দিলে ভাল হয়!

দেবরাজ মুখোপাধ্যায়

অষ্টম শ্রেণি, পাহাড়হাটি গোলাপমণি হাই স্কুল, বর্ধমান

‘রাপ্পা রায় এবং বাদামি চেয়ার’ অসাধারণ লেগেছে। ডিসেম্বর সংখ্যার পাঁচটি গল্পই বেশ ভাল। তবে ‘পুজোয় ছুটিপুর’ গল্পটি ততটা ভাল লাগেনি।

চুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চম শ্রেণি, খেজুর ছাতনি কে এন হাই স্কুল, বর্ধমান

নভেম্বর সংখ্যা খুব ভাল

নভেম্বর সংখ্যার ‘লাল জ্যাকেট’ গল্পটি অসাধারণ লেগেছে। ‘ভাল মাস্টারমশাই’ গল্পের পরেশবাবুর চরিত্রটি আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। তবে ‘মৃত্যুঞ্জয়’ গল্পটি তেমন ভাল লাগেনি। মাঝে-মাঝে দু’-একজন বিখ্যাত মানুষের সাক্ষাৎকার দিলে খুব ভাল লাগবে!

সেখ আনম পরভিন

অষ্টম শ্রেণি, বর্ধমান পৌর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

ভুল তথ্য

আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীতে লেখা হয়েছে আন্দ্রে আগাসি গোল্ডেন স্লাম খেতাব পেয়েছেন। এটা ঠিক নয়। আগাসি একই বছরে দু’টির বেশি গ্র্যান্ডস্লাম জেতেননি।

কোয়েল ঘোষ

নবম শ্রেণি, বি ডি মেমোরিয়াল হাই স্কুল, প্রতাপগড় শাখা, কলকাতা

সম্পাদকীয় উত্তর: আন্দ্রে আগাসি ‘কেরিয়ার গোল্ডেন স্লাম’ খেতাবটি জিতেছেন। ভুলবশত ‘কেরিয়ার’ শব্দটি না থাকায় এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।



ডাকবাক্স বিভাগ নেই

নভেম্বর সংখ্যার আনন্দমেলায় ‘ডাকবাক্স’ বিভাগটি না থাকায় দুঃখ পেলাম। এই বিভাগে যারা নিয়মিত চিঠিপত্র পাঠায়, তাদের পক্ষে ব্যাপারটি খুবই হতাশাজনক!

রিমা মণ্ডল

বি জি হাই স্কুল, রানাঘাট

চন্দন দাস

নবম শ্রেণি, বেলুড় হাই স্কুল

‘রাজা নেপচুনের তরবারি’ উপন্যাসের কাহিনি নকল

নভেম্বর সংখ্যায় অমিতাভ পালের ‘রাজা নেপচুনের তরবারি’ উপন্যাসের কাহিনিটি লেখকের নিজস্ব নয়। ফ্যান্টমের কাহিনি দশ শতাংশ বদলে বাকি ৯০ শতাংশ উনি হুবহু নকল করেছেন। এখনকার ছেলেমেয়েরা অনেকেই হয়তো ফ্যান্টম পড়ে না। তাই তারা ধরতে পারবে না! কিন্তু লেখক কী করে অন্যের কাহিনিটি নিজের নামে চালালেন?

অনিন্দ্য দাশ

নিউ ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

নভেম্বর সংখ্যা ‘আনন্দমেলা’র ‘ভাল মাস্টারমশাই’ এবং ‘মৃত্যুঞ্জয়’ গল্প দু’টি খুবই ভাল লেগেছে। তবে ‘লাল জ্যাকেট’ গল্পটির কাহিনি দুর্বল মনে হল। একটি কথা না লিখে পারছি না। অমিতাভ পালের ‘রাজা নেপচুনের তরবারি’ পড়তে-পড়তে ফ্যান্টমের কাহিনির ছায়া দেখতে পেলাম। একটু এদিক-ওদিক করে ওই কাহিনিটিই উপন্যাসটিতে পরিবেশন করা হয়েছে।

শমীক ভট্টাচার্য

চাকদা, ঠাকপরপাড়া, কলকাতা

> পত্রিকা কেমন লাগছে, তা আমাদের জানাও এই ঠিকানায়:
> আনন্দমেলা, ডাকবাক্স বিভাগ
> ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
> কলকাতা-৭০০ ০০১
> ইমেল: anandamela@abp.in

অমিতাভ পালের ‘রাজা নেপচুনের তরবারি’ উপন্যাসটি বেশ ভাল লেগেছে। তবে এই কাহিনিটি আগে কোথাও পড়েছি বলে মনে হল। তরবারি এবং আরও দু’-একটি প্রসঙ্গ ছাড়া সবটাই যেন আগে পড়া, যদিও কোথায় পড়েছি মনে পড়ছে না।

কিশোর ভাদুড়ি

সেনডাঙা, উত্তর ২৪ পরগনা

সংশোধন

ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত দু’ সংখ্যায় সমাপ্য উপন্যাস ‘প্রতাপগড়ের আততায়ী’র লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি। লেখকের নাম অনির্বাণ বসু।



‘তোমার পছন্দের দু’টি ইচ্ছে’ প্রতিযোগিতার ফলাফল।

পাঠকের পাতা

এবারের প্রতিযোগিতা

‘ক্রেয়ন দিয়ে পাহাড়টাকে রং করব লাল...’ কবিতার প্রথম দু’টো লাইন দিয়ে দেওয়া হল তোমাদের। এর পর কবিতাটি সম্পূর্ণ করে পাঠিয়ে দাও আমাদের দপ্তরে। যারা ক্লাস ফোর থেকে এইটে পড়ো, তারাই কবিতা পাঠাবে ২০ জানুয়ারির মধ্যে। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে কবিতাটি প্রত্যয়িত করিয়ে নিও। সেরা কয়েকটি কবিতা আমরা ২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ছাপব। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম ও ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে। এসব না উল্লেখ করলে কিন্তু তোমাদের লেখা ছাপায় আমাদের অসুবিধে হবে।

ঠিকানা:
পাঠকের পাতা
আনন্দমেলা
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০০১

১

৩১ ডিসেম্বর ২০০৭,
মাঝরাত
মেঘালয়ের প্রসিদ্ধ এলিফ্যান্ট ফল্‌সের সামনে বসে আছি আর ভাবছি, এই জল অর্থাৎ জীবনদাতা, এই পৃথিবীকে একদিন ধ্বংস করবে! কোথা থেকে এমন সময় উড়ে-উড়ে এসে একটা মেঘ আমার গা ঘেঁষে চলে যাওয়ার সময় বলে গেল, “মেঘের রাজা দিল দুই বর।”
শুনে আমি অবাক! তার কাছে একটা তুলি এবং একটা চারাগাছ চাইলাম। শত-সহস্র যুগ পরেও মানুষ এই দিনটিকে যেন উপভোগ করতে পারেন। সে আমাকে তুলি এবং চারাগাছ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, “এই বিরল পছন্দের কারণ কী?”
আমি তখন বললাম, “ওজোন লেয়ারকে এই জাদুতুলি দিয়ে রোগমুক্ত করব এবং এই চারাগাছকে আজই লাগাব, যাতে সে যুগ-যুগান্ত পর তার জাদু দিয়ে মানবজাতিকে এই দিনটি ফিরিয়ে দেয় এবং মানুষকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর হাত থেকে মুক্ত করে!”

সুরাঞ্জনা চৌধুরী
অষ্টম শ্রেণি
কারমেল হাই স্কুল
কলকাতা

২

যদি সত্যিই এরকম কোনও বার্তা আসে, তা হলে আমার প্রথম ইচ্ছে হবে, আমাদের এই ভারতমাতার বুকে যে এত অত্যাচার, লড়াই, ক্ষমতালোভী মানুষের ক্ষমতালাভের জন্য সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার, তা যেন বন্ধ হয়। আমাদের দেশে যেন শান্তি ফিরে আসে এবং এই শান্তি যেন আমাদের দেশ ও সারা পৃথিবীতে বিরাজ করে। আর আমার দ্বিতীয় ইচ্ছে হবে, আমি যখন স্কুলে যাই তখন তারকেশ্বর বাসস্ট্যান্ডে অনেক ছোট শিশুদের দেখি, যারা একটু খাবারের জন্য লোকের পা ধরে ভিক্ষে চায়। এরা ভাল করে খেতে পায় না। ইচ্ছে থাকলেও এদের পড়াশোনা করার কোনও সুযোগ নেই। এদের দেখে আমার খুব কষ্ট হয়। তাই আমার ইচ্ছে হয়, এদের থাকা-খাওয়া ও পড়াশোনার ব্যবস্থা হোক। এরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠুক। শিক্ষা আমাদের দেশের উন্নতির অন্যতম পথ। আমাদের দেশের উন্নতি মানে সকলের উন্নতি। আর সকলের উন্নতি মানে আমারও উন্নতি। আর দেশের উন্নতি হলে আমি বড় হয়ে নিজের ইচ্ছে নিজেই পূরণ করে নিতে পারব।

মৌমিতা ভৌমিক
সপ্তম শ্রেণি
তারকেশ্বর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
হুগলি

৩

৩১ ডিসেম্বর ২০০৭ সালকে ‘গুডবাই’ বলে ঘুমের দেশে চলে গেলাম। হঠাৎই একটি বার্তা এল। লেখা আছে, ‘২০০৮ সালে তোমার দু’টো স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে।’ আমি ফুটবল খেলি ও অন্যান্য খেলাধুলোয় অনেক পুরস্কার পেয়েছি। ফুটবলের প্রেরণা বাবার কাছে পাই। তিনি আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণি থেকেই ফুটবল কোচিংয়ে ভর্তি করে দেন। এর মধ্যে স্কুল ও জেলাভিত্তিক ফুটবলে অংশগ্রহণ করেছি। আমার দ্বিতীয় স্বপ্ন ভাল ‘শেফ’ হওয়ার। এখন আমি ভাল রান্না করতে পারি। এর পিছনেও বাবার অবদান। মায়ের অসুস্থতার জন্য আমি রান্না করি। মাংস ও কয়েকটি ভাল রান্না বাবাই শিখিয়েছেন। একদিন বাজার থেকে মাংস এনেও আমার দুষ্টুমির জন্য তিনি রান্না করেননি। শেষে আমি সেই মাংস রাঁধি। সেটি খাওয়ার পর আমাকে তিনি আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিলেন। দুঃখ এই যে, আমার আদরের বাবা মাত্র কিছুদিন আগে ভুল চিকিৎসার শিকার হয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছেন।
যাই হোক, ২০০৮ সালের প্রাক্কালে ধন্যবাদ জানাই আমার সত্যিকারের দু’টো স্বপ্নপূরণের বার্তাবাহককে।

দেবায়ন সরকার
অষ্টম শ্রেণি
বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়
কলকাতা



এবার বোঝা যাবে কত ধানে কত চাল!

একদিন আপনার শ্রীমতির জীবনযাপন করে দেখুন, বুঝতে পারবেন কেন ডাবর চ্যবনপ্রাশ দরকার!

আপনিও যদি ওদের মত হন যাঁরা মনে করেন শ্রীমতি তো ঘরেই থাকেন, তার আবার ডাবর চ্যবন প্রাশের কি দরকার, তাহলে শুধু একদিন ভোর বেলায় উঠুন, বাড়ির সকলের জন্যে জলখাবার বানান, বাইরে বেরোনোদের জন্যে টিফিন প্যাক করুন, তারপর বাচ্চাদের স্কুলে ছেড়ে আসুন। আরে হাঁ। এর পর আসবে ঘরদোর পরিস্কার করার পালা। তারপর বাসন নিয়ে বসা, তারপর কাপড় কাচা-শুকানো। বাচ্চাদের স্কুল থেকে নিয়ে আসা, ওদের জন্যে খাবার তৈরী করা। সন্ধে হয়ে গেলে তরি তরকারিও অবশ্যই কিনে আনবেন। তাও তাজা আর বেশ দরদাম করে। উফ্‌ফ্‌! এসব ভেবেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন-তাই না? সেজন্যেই শ্রীমতি-র চাই এমন কিছু যা তাকে রাখবে সর্বদাই স্বাস্থে ঝলমল। তাইতো প্রয়োজন ডাবর চ্যবনপ্রাশের।

আয়ুর্বেদ-এর বিশুদ্ধ পরম্পরা, যা ভিতরকার শক্তি বাড়ায় এবং ছোট খাট অসুখ বিসুখ থেকে দূরে রাখে আর তার সাথেই দেয় ভরপুর শক্তি ও স্ট্যামিনা। এতে আছেঃ-

আমলাঃ ভিটামিন সি-র ভরপুর উৎস। আমলা আমাদের শরীরকে দৈনন্দিন অসুখ-বিসুখের হাত থেকে বাঁচায়। গুড়ুচিঃ এ আমাদের শারীরিক ভাবে মজবুত করে রাখে। পিপ্পলিঃ এ সর্দিকাশি এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে দূর করে। এ ছাড়া এটি নানা স্বাস্থবর্ধক উপাদানের অভিনব মিশ্রণ। তাই বাচ্চাই হোক বা বড়, ডাবর চ্যবনপ্রাশ প্রত্যেকের জন্যেই খুব উপকারী। এবার তো বোঝ গেল যে কেন আপনার মিসেজের ডাবর চ্যবনপ্রাশের প্রয়োজন আছে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ হয়ে গেছে যে ডাবর চ্যবনপ্রাশ মহিলাদের ভেতরকার শক্তি বাড়াতে সক্ষম।

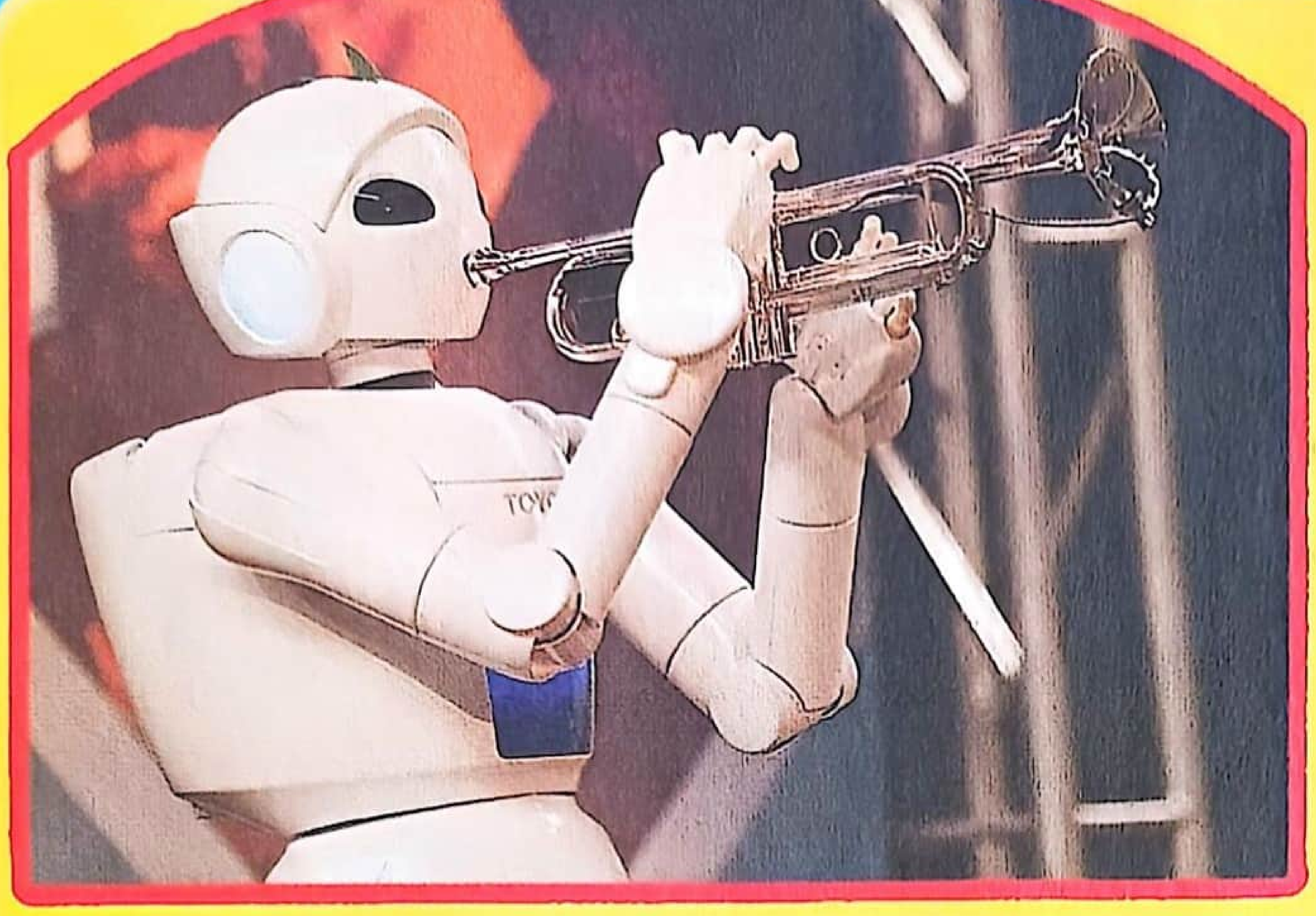


সকলের প্রয়োজন আছে!

*1 কেজি ডাবর চ্যবনপ্রাশের সঙ্গে 45 গ্রা. ডাবর হনি বিনামুল্যে!

বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের স্বাস্থ বিশেষজ্ঞ কে androonishakti@dabur.com তে ই মেইল করুন, www.dabur.com/chyawanprash তে লগ অন করুন অথবা ডাবর চ্যবনপ্রাশ ডাবর ইন্ডিয়া লি., পি.ও. বক্স-3, সাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদ-201010 কে লিখুন।

McCann/DCP/338/07



রোবট যখন সঙ্গীতশিল্পী

এবার কি গান-বাজনার আসরে মানুষের সঙ্গে রোবটকেও দেখা যাবে? সুরের মূর্ছনায় আবিষ্ট করে দেবে শ্রোতাদের? রোবোটিক টেকনোলজি যেভাবে এগিয়ে চলেছে, মনে হয়, সেদিন আর বেশি দূরে নয়! জাপানের টয়োটা কোম্পানির তৈরি 'টমি' তো ট্রাম্পেট বাজাতে ওস্তাদ। টমি চার ফুট আট ইঞ্চি লম্বা। ওজন ৮৮ পাউন্ড। ট্রাম্পেট বাজানোর সময় টমির ঠোঁট কাঁপতে থাকে ঠিক মানুষের মতোই। আর দক্ষ মিউজিশিয়ানের মতো ট্রাম্পেটের উপর খেলা করে টমির আঙুল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে 'ডেট্রয়েট সায়েন্স সেন্টার'-এ ট্রাম্পেট বাজাচ্ছে এই হিউম্যানয়েড রোবটটি।

রহস্যময় মহাকর্ষীয় তরঙ্গ

গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ অর্থাৎ মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্বের সন্ধান করছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। এই মহাকর্ষীয় তরঙ্গের কথা প্রথম বলেছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। কোনও মহাজাগতিক বস্তু যদি মহাকাশে খুব দ্রুতগতিতে নড়াচড়া করে, তা হলে তৈরি হয় মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। এই তরঙ্গের অস্তিত্বের পরোক্ষ কিছু প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই তরঙ্গ পরিব্যাপ্ত কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন তাঁরা। এখন বিজ্ঞানীরা তাকিয়ে আছেন 'লেসার ইন্টারফারোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ অবজ়ারভেটরি'র দিকে। নতুন এই অবজ়ারভেটরি মহাশূন্যে তন্নতন্ন করে খুঁজে চলেছে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। অবজ়ারভেটরির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির গবেষকরা। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ এই অবজ়ারভেটরির ডিস্ক-এ ধাক্কা খেয়ে শব্দে রূপান্তরিত হবে। আর তা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জেনে যাবেন যাবতীয় তথ্য।

খোঁজ পাওয়া গেল নতুন গ্যালাক্সির

নতুন গ্যালাক্সির সন্ধান পেয়েছে হাব্‌ল এবং স্পিৎজ়ার স্পেস টেলিস্কোপ। একটা-দু'টো নয়, মোট ন'টা গ্যালাক্সি। আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির চেয়ে আয়তনে অনেক-অনেক ছোট এগুলো। কোনওটা একশো গুণ ছোট, কোনওটা বা হাজার। এত ছোট গ্যালাক্সির অস্তিত্ব অবাক করেছে বাল্টিমোর-এর স্পেস টেলিস্কোপ সায়েন্স ইনস্টিটিউট-এর নর পিরজ়কালকে। তিনি বলেছেন, "আজ পর্যন্ত যত গ্যালাক্সি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে এগুলোর ভর সবচেয়ে কম।" নাসার বিজ্ঞানীদের দাবি, সৃষ্টির উষাকালে, অর্থাৎ, বিগ ব্যাংয়ের পর এক বিলিয়ন বছরের মধ্যে তৈরি এই সব গ্যালাক্সি থেকে পাওয়া যাবে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির অনেক প্রশ্নের উত্তর।



শান্তশিষ্ট ডাইনোসর



নাইজারসরাস ট্যাকুইসি। এক কোটি দশ লক্ষ বছর আগে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াত সরোপড ডাইনোসরের এই প্রজাতিটি। অবশ্য দাপিয়ে বেড়াত বললে ভুল হবে। কারণ, খুবই শান্তশিষ্ট ছিল এরা। সহারা মরুভূমি থেকে এই ডাইনোসরের ফসিল আবিষ্কার করেছেন প্যালেন্টোলজিস্ট পল সেরিনো। সম্প্রতি এই ডাইনোসর সম্বন্ধে একেবারে নতুন কিছু তথ্য আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। উত্তর আমেরিকায় ঘুরে বেড়ানো ডাইনোসর ডিপ্লোডকাস-এর খুব নিকট আত্মীয় নাইজারসরাস। অনেকটা গোরুর মতো ছিল নাইজারসরাসের আচার-আচরণ। তিরিশ ফুট লম্বা, আকারে-আয়তনে এখনকার একটা হাতির মতো এই প্রাণীটি জীবনধারণ করত শাকপাতা খেয়ে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, খিদে পেলে মুখ দিয়ে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো টেনে নিত খাবারদাবার। তারপর একশোরও বেশি ছোট-ছোট দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেত সেগুলো। সঙ্গের ছবিটি নাইজারসরাসের। রাখা আছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক মিউজ়িয়ামে। এটি জ্যান্ত নয় কিন্তু, আর্টিস্ট টাইলার-এর তৈরি একটি মডেল।

জয় সেনগুপ্ত



Dabur
সেই ভিতরকার শক্তি,
এবার Chocolate Granules এ।
Dabur
Chyawan Junior
HEALTH FOOD FOR ANDROONI SHAKTI
With Tasty Chocolate Granules
FREE
Apun ka Style
Sipper with this pack
এটাই আমার স্টাইল



বড়বাবুর তবলা

দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়

তবলাটা সস্তায় পেয়ে হরিচরণের খুশি আর ধরে না। তার অনেক দিনের শখ ওই বাঁয়া-তবলা। সে সাধ তার পূরণ হল। গোঁসাইগিন্নি ভিটেমাটি ছেড়ে শহরে যাওয়ার আগে তাকে বললেন, "হরি, তুই কী নিবি বল?"

"আজ্ঞে, বড়বাবুর তবলাটা যদি দেন।" হরিচরণ পালঙ্কের নিচটা দেখাল।

"ওমা! ও জিনিস নিয়ে কী করবি হরি? তা ছাড়া, তুই তো গানের গ-ও জানিস না।"

হরিচরণ নাছোড়। গোঁসাইগিন্নি দেখলেন এ জিনিস সঙ্গে নেওয়াও যা, ফেলাও তা। বড়বাবুর পরে এ বাড়িতে কোনও কালে কেউ বাজায়নি। পড়ে থাকার চেয়ে হরির কাছে থাকাই ভাল। গোঁসাইগিন্নি বললেন, "মনে যখন ধরেছে, নিয়ে যা।"

তবলা মাথায় করে ঘরে চলল হরিচরণ। ঘর মানে শশীবাবুর ঘর। বাড়ির ফাইফরমাশ খাটে হরি, রাতে সিঁড়ির নীচে ঘুমোয়। তবলাটা নিয়ে হরি প্রাণভরে দেখল। দড়িদড়া ঝুলে পড়েছে, চামড়াও কেমন ফ্যাসফেসে, তা হোক তবু তো তবলা। সে মাথার কাছে তবলা রেখে ঘুমোল।

পরের দিন সকাল হতেই হরিচরণ আশ্চর্য হয়ে গেল। সে দেখল, শশীবাবু সিঁড়ির পাদানিতে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছেন। রসগোল্লার রস চুইয়ে পড়ার মতো প্রকাণ্ড মুখ থেকে হাসি চুইয়ে পড়ছে। হরিচরণের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। শশীবাবুর মতো রাশভারী লোক এ তল্লাটে নেই। তাঁর মুখে কোনও দিন হাসি দেখেছে কি না তা মনে করতে পারল না হরিচরণ।

শশীবাবু বললেন, "আজ থেকে তোর কাজের ছুটি হরি।"

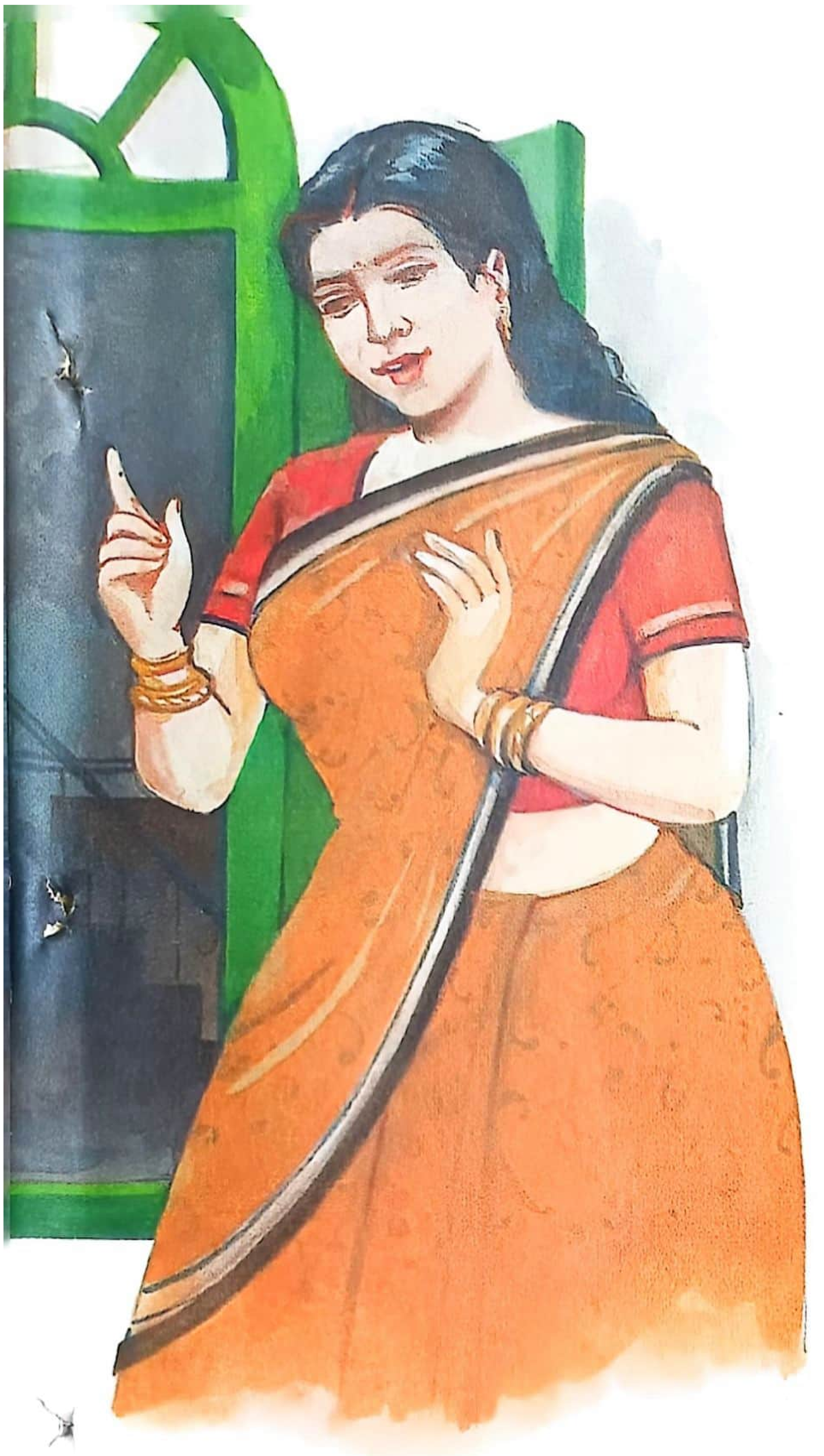
হরিচরণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। শশীবাবুর কথার মাথামুন্ডু না বুঝে সে ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, "আজ্ঞে, আমার অপরাধ যদি বলেন কর্তাবাবু!"

"অপরাধ। হুম। অপরাধ তো একটা করেছিস হরিচরণ। আমাকে কোনও দি বলিসনি তুই এত সুন্দর তবলা বাজাতে পারিস।"

"বাবু বলেন কী?"

"ওরে আমি কি তোর পর?" শশীবাবু





ধরা গলায় বললেন, “তুই ভাল বাজালে আমার সুখ্যাতি হবে না? দাঁড়া, এবার তোকে ভাল-ভাল জায়গায় নিয়ে যাব দেখিস।”

“কিন্তু,” আমতা স্বরে বলল হরিচরণ।

“নো কিন্তু! তুই কি চাস তোকে খাটিয়ে-খাটিয়ে মেরে ফেলি? বাজা, ভাল করে বাজা।” বলে শশীবাবু আর দাঁড়ালেন না।

হরিচরণ হতভম্ব হয়ে গেল।

কিছু পরে গিন্নিমা উপর থেকে ডাকলেন। হরিচরণ এক দৌড়ে তাঁর কাছে গেল। হরিচরণ ভাবল গিন্নিমা নিশ্চয়ই তার উপর খেপে আছেন। কারণ, সংসারের অনেক কাজ এখনও বাকি। ভয়ে-ভয়ে সে সামনে এসে দাঁড়াল। গিন্নিমা বললেন, “আয় হরি। এসে বোস।”

হরিচরণ ভিতরে ঢুকে মেঝেয় ধুপ করে বসল।

“নে, দুধটা খেয়ে নে তো। মুখটা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে।” গিন্নিমা বললেন।

নিজের কানকে বিশ্বাস হল না হরিচরণের। হল কী গিন্নিমার! তাকে বকুনি দেওয়ার বদলে দুধ খাওয়াচ্ছেন। লজ্জা-লজ্জা মুখ করে এক বাটি দুধ চোঁ-চোঁ করে খেয়ে নিল।

গিন্নিমা বললেন, “কী ভাল হাত রে হরি তোর! কাল রাতে এমন বাজালি যে আমার নাচতে ইচ্ছে করল, অমনি আমার বাতের ব্যথা ভ্যানিশ।”

“অ্যাঁ! বাতের ব্যথা নেই?” হরিচরণ চোখ কপালে তুলে বলল।

“এই দ্যাখ।” বলে গিন্নিমা দু’-পাক নেচে দেখালেন।

হরিচরণ মাথা চুলকোল। ব্যাপারটা বড় গোলমেলে ঠেকছে তার। সত্যি বলতে কী তার গা একটু ছমছম করছে। সে কস্মিনকালে তবলা বাজায়নি, অথচ সারা রাত নাকি তবলা শুনেছেন গিন্নিমায়েরা। হরিচরণ গিন্নিমাকে বিদায় জানিয়ে অন্যমনস্কভাবে নিজের ঘরে এল। গোঁসাইরা থাকলে না হয় কিছু জানা যেত।

বাঁয়া-তবলার গায়ে আলতো করে হাত বোলাল হরিচরণ। তারপর আঙুল দিয়ে চাঁটি মারল। ঠ্যাং করে একটা শব্দ হল। অমনি কে যেন বলে উঠল, “হাত নয় তো কুড়ুলের কোপ!”

“কে, কে বলল?” হরিচরণ সিঁড়ির চারপাশে চোখ বোলাল।

দিনেদুপুরে পাড়ার কেউ কি কথাটা বলে সিঁড়ি দিয়ে পালাল? সে আবার তবলায় মনোযোগ দিল। ঢ্যাস করে শব্দ করতেই এবার গলাটা যেন ফেটে পড়ল, “বলি অ্যাঁ, ইয়ার্কি হচ্ছে?”

কথাটা যে তবলার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল তা বুঝতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না হরিচরণের। সে ভয়ে দু’-লাফ মেরে চৌকাঠ ডিঙিয়ে সোজা দৌড় দিল। মহাকালীতলার মোড়ের মাথায় সে দু’-দণ্ড দাঁড়িয়ে এক বিঘত লম্বা শ্বাস ফেলল। ভাবলে এখনও তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। তবলা নিয়ে সে যে কী বিপদে পড়ল! হরিচরণ একটা চায়ের দোকানে জিরিয়ে নেওয়ার জন্য বসল। শরীরটা ধাতস্থ হতে সে ভাবল, এখন তো দিনেরবেলা, এত ভয়ের কী আছে? দেখা যাক না কী হয়? এই মনে করে হরিচরণ পায়ে-পায়ে ঘরে ঢুকতেই একটি প্রশ্ন শুনতে পেল, “কী, আবার ফিরলে যে?”

“তুমি কে?” সাহস করে সে জিজ্ঞেস করল।

“সে খবর জেনে তোমার কী হবে? তাতে কি পেট ভরবে?” তবলার মধ্যে থেকে একটা রাগী গলা ভেসে এল।

গলা শুনে হরিচরণ কুঁকড়ে সিঁড়ির সামনে ঘেঁষে দাঁড়াল। তার বুকে একটা ধুকপুকুনি হচ্ছে। বড়-বড় শ্বাস পড়ছে।

তবলার দিকে সে তাকিয়ে আছে। একটু নড়লেই আবার দৌড় দেবে। হরিচরণ বলল, "কাল রাতে বাজনা বাজিয়েছিল কে?"

"আমি ছাড়া আর কে? তোমার তো মুগুরের মতো হাত।" গলাটা ফ্যাস করে বলল।

কথাটা শুনে হরিচরণের বড় খারাপ লাগল। নিজের হাতের উপর তো আর তার হাত নেই! সে ফোঁত করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি নিজে-নিজে বাজলে আর বিপদ হল আমার।"

"কিসের বিপদ?"

হরিচরণ আনুপূর্বিক জানাল, শশীবাবু তাকে দিয়ে ফাংশান করাবে।

"সে তোমার বিপদ, আমি কী জানি?" তবলার মধ্যের গলাটা ঠোঁট উলটে বলল, "আর শোনো বাপু, একটা কথা বলি, তবলার গায়ে কিন্তু ভুলেও হাত দেবে না।"

এ তো মহাবিপদ! হরিচরণ চোখ কপালে তুলল। সে বলল, "যদি তবলা না বাজাই তবে আনলাম কেন?"

"আনতে কে বলেছিল?"

হরিচরণের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। তার নিজের হকের জিনিস অথচ সে বাজাতে পারবে না। ফাংশানের কথা শুনে সে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল ক'দিনের মধ্যে সে হাত তৈরি করে নেবে। কিন্তু তা আর হল কই? হরিচরণ শশীবাবুর কথা ভেবে ভয়ে-ভয়ে কেঁপে উঠল। সে অনেক কষ্টে দাঁতে-দাঁত চেপে বলল, "ছিলে তো খাটের নীচে, আমি না থাকলে তোমাকে কে উদ্ধার করত শুনি?"

হরিচরণের কথার উত্তর এল না।

॥ ২ ॥

ক'দিন হরিচরণের বেশ ঝালে-ঝোলে অম্বলে কাটল। শশীবাবুর কড়া নির্দেশে তার কাজ-কাম কিছু নেই। শুধু তবলা প্র্যাক্টিস। হরিচরণ শুনে হা হু করল, কিন্তু মুখ ফুটে সত্যি কথা বলতে পারল না।

গিন্নিমা'র পায়ের বাত পুরো ভ্যানিশ। দিব্যি সিঁড়ি ভাঙছেন, তরতর করে নেমে হরিচরণেকে এটাসেটা খাবার দিয়ে যাচ্ছেন। সে যত 'না না' করছে, গিন্নিমা বলছেন, "ওরে হরি খা, সারারাত জেগে থাকার ধকল আছে তো।"

হরিচরণ লজ্জার হাসি হাসে। সে বাইরে যাওয়ার মন করতেই গিন্নিমা তাকে ধরে বললেন, "ছিঃ হরি, কাঠফাটা রোদে কেউ বাইরে যায়? তার চেয়ে ঘুমো দিকি, সারারাত জেগে আছিস।" এই বলে গিন্নিমা তার বিছানা-বালিশ পেতে দিলেন। তারপর অভিমান করে বললেন, "তোকে কত করে বললাম উপরে চল, সিঁড়ির চাতালে কেউ থাকে?"

"এই ভাল আছি মা।" হরিচরণ সঙ্গে-সঙ্গে বলল। পাগল, বাবু-মায়ের কাছাকাছি সে থাকবে? তার চেয়ে সিঁড়িঘরই ভাল।

কিন্তু মনে তার শান্তি নেই। সবসময় একটা ভয় টিপটিপ করছে। ফাংশানের দিন তার যে কী হবে? শশীবাবুর রাগী মুখটা মনে হতেই হরিচরণ ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। জুতো মেরে-মেরে তার হাড়গোড় গুঁড়ো করে দেবেন।

সত্যি কথাটা বলার উপায় খোঁজে হরিচরণ। কিন্তু উপায় আর হয় না। একদিন বলি-বলি করেও বলা হল না তার। গিন্নিমা খাবার দিচ্ছেন, সাহসভরে হরিচরণ কথাটা বলল, "মা, অভয় দেন তো একটা কথা বলি।"

"বল।"

"তবলা কিন্তু আমি বাজাই না মা।"

"পাগল ছেলের কথা শোনো, তা'লে কে বাজায়? ভূতে?" হাসিমুখে গিন্নিমা বললেন।

"হ্যাঁ মা।"

গিন্নিমা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হরিচরণের মাথার চুল ঘেঁটে দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ রে হরি, ভূত বাজায়?"

হরি আর কী করবে। সে ফোঁত করে একটা নিশ্বাস ফেলল। তখন গিন্নিমা বললেন, "খুব কষে প্র্যাক্টিস কর হরি। ফাংশানে তোর বাবুর এক বন্ধু গাইতে আসবেন। ওঁর সঙ্গে তোকে বাজাতে হবে। তাঁর নাকি ভারী গুমর! সব তবলচির হাত তাঁর সামনে কাঁপে। তোর কথা বড় মুখ করে বলে এসেছেন বাবু।"

শুনে হরিচরণের বুক ধড়পড়ানি বেড়ে গেল। আর মোটে কয়েকটা দিন! দু'-একবারও যদি তবলাটা বাজাতে পারত। রাতে সাহসভরে সে কথাটা ছুড়ে দিল।

তবলার ভিতর থেকে গলাটা ফোঁস করে উঠল, "এই তবলা শেখা অত সহজ নাকি?"

অভিমানভরে হরিচরণ কিছু বলল না। তার হঠাৎ মনে হল, রাত জেগে তবলা শুনলে কেমন হত? বাবু-গিন্নিমা তো রাতে রোজ শোনেন। অথচ প্রতি রাতে শোনার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ে, আজ শুনবেই। জেদ চেপে গেল হরিচরণের। একটু পরেই তার চোখে চোখ লেগে গেল।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল হরিচরণের। আবছা আঁধারে সে একটা সাদা ধবধবে লোককে তবলার সামনে বসে প্রাণভরে তবলা বাজাতে দেখল। হরিচরণ বেদম ভয়ে থরথর করে কেঁপে মুখে 'আঁক' শব্দ করে উঠল।

মুহূর্তে তবলা বাজানো বন্ধ করে লোকটা ঘুরে হরিচরণের দিকে বাঘের মতো চোখ করে কর্কশ স্বরে বলল, "বদমাশ, দিলি তো তাল কেটে? অ্যাঁ!"

পলকে মুখটা চিনতে পারল হরিচরণ! গোঁসাই বাড়িতে এঁর বড় ফোটো দেখেছে সে। গোঁসাইগিন্নি রোজ মালা পরাতেন। গোঁসাই বড়বাবু খুব বড় বাজনদার ছিলেন। হরিচরণ তবলা বাজানো না জানলেও এত দিন বড়বাবুকে গুরুদেব মেনেছে। তার গায়ে কাঁটা দিল। বড়বাবু তো মারা গিয়েছেন কত দিন আগে, তবু বাজনার টানে আবার তিনি ফিরে এসেছেন। ভয়ে ভক্তিতে হরিচরণ ওঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ার আগেই বড়বাবু ভ্যানিশ হয়ে গেলেন।

হরিচরণ আকুল হয়ে বলল, "বড়বাবু, আমি বুঝতে পারিনি, আমাকে মাপ করুন। আমি এই একশোটা কানমলা দিচ্ছি।"

কিন্তু বড়বাবু আর এলেন না। তবলার ভিতর থেকে গলাটা ফোঁস করে উঠে বলল, "মর্কট।"

দু' চোখ বেয়ে অঝোরে জল নামল



হরিচরণের। শশীবাবুর সুচলো ডগাওয়ালা জুতোর কথা তার মনে পড়ল। তার কপালে যে কী নাচছে! কপাল নয়, পিঠে।

॥ ৩ ॥

ফাংশানের ঠিক দু' দিন আগে শশীবাবুর গাইয়ে বন্ধু গিরিন তালুকদার হাজির হলেন। চেহারা দেখে হরিচরণ কাঠ হয়ে গেল। গাড়ি থেকে নামবার সময় দু'টো লোক দু' পাশ টেনে ধরল। মাথায় চুল একদমই নেই কিন্তু বাঘের লেজের মতো গোঁফ আছে। তাই দেখে হরিচরণ সিঁড়িঘর থেকে কেটে পড়ার তাল করছিল, সেসময়েই গিরিনবাবুর চোখে পড়ে গেল সে। গিরিনবাবু চোখ মটকে বললেন, "অ্যাই ছোঁড়া, হাঁ করে দেখছ কী? মালপত্র নামাও।"

হরিচরণ দৌড়ে এসে হাত লাগাল।

"কই হে, বাড়ির লোকজন সব গেল কোথায়? কাউকে দেখছি না!" গিরিনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে, বাবু গিয়েছেন বাজারে, গিন্নিমা মন্দিরে।"

"অঃ।" গিরিনবাবু একটা পান মুখে দিয়ে কচরমচর করে চিবোতে-চিবোতে বললেন, "হ্যাঁ রে, সে ছোঁড়াটা কোথায়?"

"কে বাবু?"

"শশী নামটা কী যেন বলেছিল। খুব নাকি ভাল তবলা বাজায়।" গিরিনবাবু তাচ্ছিল্য স্বরে বললেন, "আর বাজাবে কি না এই শর্মার সঙ্গে! হাতিঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল! ফু।"

ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল হরিচরণের। শশীবাবুর আর কাজ নেই, দুনিয়াভর কথাটা রাষ্ট্র করে দিয়েছেন। তার জন্য গাঁয়ে-গঞ্জে সকলে মিলে অপদস্থ করে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে তাকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করে, 'তবলা দেখতে কেমন হরিদা?' তাই সে মনে-মনে ভাবল গিরিনবাবুকে সত্যি কথাটা বলে দিলে হয়। ওঁর পায়ে ধরলে নিশ্চয়ই বড়বাবুর তবলা বাজানোর কথা অবিশ্বাস করবেন না।

কিন্তু কথাটা বলতে পারল না হরিচরণ। গিরিনবাবু সিঁড়িঘরের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ভ্রু কুঁচকে তিনি বাঁয়া-তবলা দেখছেন। একটু পরে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কার?"

মিথ্যে কথা বলতে পারল না হরিচরণ। সে কাঁচুমাচুভাবে বলল, "আজ্ঞে, এটা আমার।"

গিরিনবাবু একবার তবলা একবার হরিচরণের মুখ দেখলেন। তারপর আপনা থেকে একচোট হেসে নিয়ে বললেন, "ও, তুমিই সেই লোক? তা বাপু ওটা তবলা না জুতোর বাক্স? না আছে গাব, না আছে গট্টে, বাজনা কি তা হলে এমনি-এমনি বাজে?"

"সে কথা তো আমিও বলি।" হরিচরণ মিনমিন স্বরে জবাব দেয়।

"মানে?"

"আজ্ঞে, কে যে বাজায় তা বুঝি না।"

গিরিনবাবুর ফরসা গোলগাল মুখটা মুহূর্তে লাল হয়ে গেল। রাগে ফেটে পড়লেন তিনি। হরিচরণের দিকে তেড়ে এসে বললেন, "অ্যা, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? একটা রদ্দা মেরে তোমার মজা ঘুচিয়ে দেব।"

হরিচরণ ভয়ে হুড়মুড় করে দৌড় দিল। আর-একটু হলে ঘাড়ে গিরিনবাবুর রদ্দা পড়ত। সে ব্যাজার মুখে ভাবল, সত্যি কথা বলাও মুশকিল। কেউ তা বিশ্বাস করে না।

গিরিনবাবুর কাছে ভয়ে সে ঘেঁষল না। দূর থেকে ওঁর গানের রেওয়াজ শুনল। এই না হলে গান, গলা খেলিয়ে যখন ছাড়লেন তখন শশীবাবুর বাড়ি কেঁপে উঠল। গিন্নিমা টুলে চড়ে আচার পাড়ছিলেন। গিরিনবাবুর গান শুনে পড়ে গিয়ে পা মচকালেন।

অবশ্য শশীবাবুর কিছু হয়নি। বহাল তবিয়তে গান শুনে মাথা নাড়াচ্ছেন। হরিচরণ খেয়াল করল ওঁর দু' কানে তুলো গোঁজা।

রিহার্সাল শেষ হওয়ার পর গিরিনবাবু বললেন, "জীবনে কত তবলচি দেখলাম কেউ আমাকে দাবাতে পারল না! শেষে তুমি একটা ডেঁপো ছোকরাকে জোগাড় করে আনলে? ছো!"

"হরিচরণ ভারী সুন্দর বাজায় গিরিন।"

"রাখো তোমার ভাল বাজনা। গোঁসাই বাড়ির বড়বাবুও তো শুনেছিলাম ভাল বাজান। তা আমার সঙ্গে বাজাতে গিয়ে তো কেঁদেকেটে একশা। আমার হাত-পা ধরে ক্ষমা চেয়ে বাঁচলেন। মনের দুঃখে বেশি দিন বাঁচেনওনি।" গিরিনবাবু বললেন।

হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল হরিচরণের। বলেন কী? বড়বাবু পর্যন্ত হেরে ভূত হয়ে গিয়েছিলেন। না হে, তার এক মুহূর্ত এখানে থাকা ঠিক নয়। পালিয়ে যাওয়াই মঙ্গল। নইলে ফাংশানের দিন আর দেখতে হবে না। গাঁ-গঞ্জের লোক সকলে মিলে তাকে অপদস্থ করবে।

সিঁড়িঘরে ফিরে হরিচরণ জামাকাপড় গোছাতে শুরু করল। তবলার দিকে তাকিয়ে সে মৃদু নিশ্বাস ফেলল। মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। তা ছাড়া বড়বাবু তাকে তবলায় হাত দিতে বারণ করেছেন।

এ ক'দিন বড়বাবুকে আকুলভাবে ডেকেও সাড়া পায়নি হরিচরণ। আজ পালিয়ে যাওয়ার আগে সে একবার বলল, "বড়বাবু, আমি চললাম।"

অল্প সময় পরেই খসখস শব্দ হল, হরিচরণের মনে হল বড়বাবু বোধ হয় পাশ ফিরে ঘুমোলেন। সে খানিক কেশে বলল, "তা হলে চলি বড়বাবু?"

"যাবি কেন গিরিনকে ডাক।" বড়বাবু তবলা থেকে বলে উঠলেন।

"খেপেছেন আপনি? ওঁকে দেখে তো আমার হাত-পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গিয়েছে। তার উপর গলা তো একেবারে বাঘের মতো।"

"অঃ, সেজন্যই তুই পালিয়ে যাবি? ছিঃ!"

"আপনিও তো পালিয়েছিলেন। তার বেলা?" হরিচরণ রাগ করে বলল।

"কে বলল কথাটা?"

"কে আবার গিরিনবাবু।"

"অ্যাঁ, একথা বলল গিরিন? এত বড় সাহস যে আমার নিন্দা করে!" রাগে তোম্বা হয়ে বড়বাবু বললেন, "ছেলেবেলায় কম মার খেয়েছে আমার হাতে? কত বলেছি, গানবাজনা হল সাধনার জিনিস, হেলাফেলার নয়। তা সে কথা শোনার ছেলে সে নয়। বাবার পয়সায় ফুটানি মেরে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে।"

"ওসব কথা বলবেন না বড়বাবু, গিরিনবাবুর গানের গলা বেশ।" হরিচরণ বলল।

"ষাঁড়ের গলা। আমি বাজালে কখন পটকে দিতাম।" বড়বাবু বললেন।

"গুল আর ঝাড়বেন না।" হরিচরণ বলল, "গিরিনবাবুর কাছে সব তবলচিই নস্যি।"

"তাই নাকি?" বড়বাবু রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "যা, নিয়ে আয় গিরিনকে, মজা দেখাচ্ছি।"

"সত্যি-সত্যি যাব!" হরিচরণ বলল, "পালাবেন না তো?"

"যাবি!" বড়বাবু খেঁকিয়ে উঠতেই সে দৌড় দিল।

গিরিনবাবুর ঘরের সামনে বারকয়েক পায়চারি করার পর হরিচরণ দুম করে ভিতরে ঢুকল। গিরিনবাবু বসে-বসে ঢুলছেন। শশীবাবু চোখ বুজে কানে তুলো গুঁজে সমানে মাথা নাড়ছেন। সে একবার গলাখাঁকারি দিতে গিরিনবাবু সজাগ হয়ে বললেন, "ও তুমি! কী চাই?"

হরিচরণ ভয়ে-ভয়ে সব কথা বলল।

গিরিনবাবুর ঢুলুনিভাব কেটে গিয়েছে। ওর দিকে জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে বললেন, "সকালেই কি আফিম চড়িয়েছ হরিচরণ? বড়বাবুকে তুমি পেলে কোথায়?"

"বিশ্বাস না হয় নিজের কানেই শুনবেন চলুন।" হরিচরণ বলল।

গিরিনবাবুর ঠেলাঠেলিতে শশীবাবু কানের তুলো খুললেন। সব শোনার পর তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ভাল করে তাকালেন হরিচরণের দিকে। মাথার ব্যামো দেখা দিল নাকি ছোকরার! তারপর কী যেন ভেবে বললেন, "অত করে যখন বলছে না হয় দেখেই আসি গিরিন। নইলে ওর একদিন কী আমার...।"

ব্যাজার মুখে রাজি হলেন গিরিনবাবুও।

লাফিয়ে-লাফিয়ে নীচে নামল হরিচরণ। সিঁড়িঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে হাঁক মারল, "বড়বাবু, বাইরে আসুন, গিরিনবাবু এসেছেন।"

কিন্তু বড়বাবুর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। হরিচরণের মুখ শুকিয়ে গেল। সে কাতর স্বরে ডাকল, "বড়বাবু।"

"কই হে, কোথায় তোমার বড়বাবু?" রগুড়ে গলায় গিরিনবাবু বললেন।

"আজ্ঞে, ছিল তো," হরিচরণ মিয়নো স্বরে বলল। একটু দূরে শশীবাবুর দিকে সে সভয়ে তাকাল। বড়বাবু তাকে বিপদে ফেলে দিয়ে সটকেছেন।

মুখে মুচকি হাসি নেই শশীবাবুর। তবলাটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। ভাঙা তবলা। ওতে কি আর বাজনা বেরোয়! তাঁরা নিশ্চয়ই ভুল শুনেছেন। আর হরিচরণও কেমন চালাক, ভালমন্দ খাবার লোভে এত দিন টুঁ শব্দ করেনি। এ ক'দিন দুধ-ঘি ওকে কম খাইয়েছেন? ভেবে শশীবাবুর মেজাজ বিগড়ে গেল। 'ব্যাটা জোচ্চোর' বলে তিনি ধাঁই করে তবলায় লাথি মারলেন। গিরিনবাবুও একটা লাথি মারলেন বাঁয়া-তবলায়। উঠোনে ছিটকে পড়ল বাঁয়া-তবলা।

শশীবাবু জ্বলজ্বলে চোখে সুচলো ডগাওলা চটি হাতে ডাকলেন, "এদিকে আয় হরি।"

হরিচরণ সঙ্গে-সঙ্গে দু' লাফ মারল। বাইরে দাঁড়িয়ে সে বড় করে নিশ্বাস ফেলল। উফ! বড় বাঁচা সে বেঁচে গিয়েছে।

একটু যেতে না যেতেই হরিচরণ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সিঁড়িঘর থেকে তবলার শব্দ ভেসে আসছে। পা টিপেটিপে ফিরে এসে উঁকি মেরে তাজ্জব হয়ে গেল। পেটে গুড়গুড়ে হাসি উঠল তার।

বড়বাবু দিব্যি তবলা বাজাচ্ছেন। শশীবাবু বাঁয়া-তবলা, গিরিনবাবু তবলা। মাথায় চাঁটি মেরে বোল তুলছেন বড়বাবু। থেকে-থেকে গিরিনবাবু বলছেন, "এই নাক-কান মলছি বড়বাবু, আর কখনও গুরুনিন্দা করব না।"

শশীবাবু বলছেন, "মাপ করে দিন বড়বাবু। আর কখনও তবলায় লাথি মারব না।"

হরিচরণকে দেখে বড়বাবু আলতো করে চোখ টিপলেন। হরিচরণ উবু হয়ে বসে বাজনা শুনল। উফ, কী হাত বড়বাবুর! গায়ে কাঁটা দিল তার। সেও যদি এমন বাজাতে পারত। বড়বাবু মনের কথা টের পেলেন। তিনি বললেন, "হবে রে হবে। সাধনায় সব মেলে।"

উবু হয়ে তবলা শোনার জন্য বসল হরিচরণ।

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

রোজ ব্রাশ করা সত্ত্বেও যদি দাঁতে ব্যথার সমস্যা লেগেই থাকে... তাহলে কি করবেন?



ডাবর রেড টুথপেস্ট বারো সপ্তাহ ধরে নিয়মিত ব্যবহার করলে তা দাঁতকে নানান সমস্যা থেকে দূরে রাখতে পারে।

বিভিন্নরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে এটা অত্যন্ত উপকারী এক টুথপেস্ট।

- দাঁতের টার্টার এবং প্লেকের আস্তরণ 27.8% হ্রাস করে।
- জিঞ্জিবাইটিস/মাড়ির ফোলা 28.7% হ্রাস করে।
- নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ 40.4% হ্রাস করে।



দাঁতের সাধারণ সমস্যাগুলি

বলা হয়ে থাকে যে দাঁতের যন্ত্রণায় আমাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। কেন না এই ব্যথা সোজা মস্তিষ্কে গিয়ে আঘাত করে। শুধুমাত্র দাঁতের ব্যথাই নয়, দাঁত ও মাড়ির সাথে সম্পর্কিত এমন অনেক সমস্যাই রয়েছে। যেগুলির প্রতি সময় মত নজর না দিলে তা আপনার মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে।

দাঁতের একটি সাধারণ সমস্যা হল, দাঁতে পোকা হওয়া। এর ফলে দাঁতে অসহ্য ব্যথা হয় এবং সেই দাঁতগুলোতে কালো কালো দাগ এবং ফুটো হয়ে যায়।

দাঁতের আর একটি সাধারণ সমস্যা হচ্ছে দাঁতে ঠান্ডা লাগা বা গরম লাগা। এটা যে কারণে হয় তা হল মাড়ি নিচের দিকে নামতে থাকা। পরিণাম যখন আপনি ঠান্ডা বা গরম কিছু খাবেন তখন দাঁতে শিরশির করবে।

আপনার বিচার বিশ্লেষণ এবং চিন্তাভাবনা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুগ্রহ করে এই ঠিকানায় আমাদের তা লিখে পাঠান।
কনজিউমার সেল, ডাবর রেড টুথপেস্ট,
কৌশাম্বী, সাহিবাবাদ,
গাজিয়াবাদ 201010
উত্তরপ্রদেশ, ভারত।
আপনার নাম পত্রিকার পরবর্তি সংখ্যায় প্রকাশিত হতে পারে।

নিয়মিত ডাবর রেড টুথপেস্ট ব্যবহারকারীরা এই টুথপেস্টেরগুণ সম্পর্কে এরকম বলেন ঃ

"আমার ছেলে সম্ভ্রম ঘোষের দাঁতে ভিষণ ব্যথা হতো। স্কুলের শিক্ষিকা আমাকে ডাবর রেড টুথপেস্ট ব্যবহারের পরামর্শ দেন। দু'মাস হলো রোহিতের দাঁতে আর ব্যথা হয় নি। মনে হচ্ছে এ যেন ম্যাজিক!" - মীতা ঘোষ - কোলকাতা

"আমার স্বামী শক্তি নন্দী-এর মাড়িতে হাল্কা ব্যথা ও ফোলা ছিল। আমরা সমস্ত রকম টুথপেস্ট ব্যবহার করে দেখলাম। কিন্তু কোন লাভ হয় নি। তারপর আমাদের প্রতিবেশি ডাবর রেড টুথপেস্ট সম্পর্কে আমাদের বলেন। ব্যাস! তারপর থেকে তো দাঁতে আর কোনো সমস্যাই নেই।" - শিখা নন্দী কোলকাতা

দাঁতের সঠিক পরিচর্যা না হওয়ার কারণে যখন দাঁতে হাল্কা হলুদ রঙের নোংরার একটা আস্তরণ পড়ে যায় তখন কথা বলতে গেলে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বোরোয় এই সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 'হেলিটোসিস' বলা হয়।

সাধারণত মানুষের মাড়িরও অনেক রকম অসুখ হতে পারে, যেমন ফোলা ও ব্যথা এবং রক্তপড়া। এই অবস্থায় পীড়িত ব্যক্তি যখন কোনও শক্ত ফল দাঁত দিয়ে কামড়ে খায় অথবা ব্রাশ করে তখন সে রক্তের দাগ দেখতে পায়।

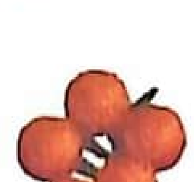
দাঁতের সমস্যা রয়েছে এরকম ব্যক্তিদের মধ্যে দাঁতের হলদেটে ভাব একটা সাধারণ সমস্যা।

প্রকৃতি + বিজ্ঞানের গুণাগুণগুলি

ডাবর রেড টুথপেস্টে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি মজুত রয়েছে যা দাঁতের অনেক সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে।



লবঙ্গ তেল ঃ লবঙ্গ তেলের প্রধান সক্রিয় উপাদান হচ্ছে 'ইউজিনাল' (70.90%) যাতে রয়েছে রোগ জীবানু নষ্ট করার ক্ষমতা। বহু বছর ধরে দাঁত ব্যথা দূর করতে এর ব্যবহার হয়ে আসছে। লবঙ্গের তেলে দাঁতের পোকা মারার গুণ রয়েছে।



তোমর বীজ ঃ তোমর-এর শুকনো বীজে এমন অনেক উপাদান রয়েছে যা দাঁতের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে। যেমন লিনলাইট অ্যাসিটেট, সিট্রল, জিরেনিওল, মিথাইল সিনামেট ইত্যাদি।



পুদিনা সত্ব ঃ এতে মূলত রয়েছে মেন্থল (50.55%) মিথাইল অ্যাসিটেট এবং মেন্থান। এর ফলে মুখ আর নিঃশ্বাস দীর্ঘক্ষণ তরতাজা থাকে।

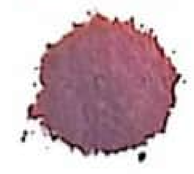


পীপলি ঃ এর ফলের মধ্যে রয়েছে 'পিপরাইন' এবং 'পিপলারিটীণ' নামক উপাদান, যা নিঃশ্বাসকে তরতাজা রাখার সাথে সাথে মাড়ির ফোলা ও ব্যথা নির্মূল করে।



সোঁঠ (আদা) ঃ এতে 'সেস্ক্যুটেপীর্ন হাইড্রোকার্বণ' (অন্তত 50%) এবং সেই সম্পর্কিত অন্যান্য উপাদান রয়েছে। জিঞ্জার ওলিয়োরেজিন-এ জিঞ্জারল, শগঅল এবং জিঞ্জারোন থাকে। আদায় ফোলা কমানো এবং জীবাণু মারার গুণও পাওয়া যায়।

কর্পূর ঃ এর জীবাণুনাশক গুণের ফলস্বরূপ দাঁতের ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং নিঃশ্বাসও তরতাজা হয়ে ওঠে।



স্বর্ণগৈরিকা ঃ এর সাহায্যে মুখের জ্বালা, ছিলে যাওয়া, ফুসকুড়ি ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, এছাড়াও মাড়ি থেকে রক্ত পড়া জাতীয় সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে।



মৎস্যপুরাণ

কাহিনি: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ছবি: অরিজিৎ দত্তচৌধুরী




...এক দৌড়ে সোজা একেবারে 'বঙ্গেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এ!
বঙ্গেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
তিনটে রাজভোগ! এই টেবিলে!
এই যে প্যালা!
বেড়ে আছিস, অ্যাঁ!
তোর লজ্জা করে না? এই সেদিন জ্বর থেকে উঠলি, আর এর ভিতরেই আবার এসব যা-তা খাওয়া শুরু করে দিয়েছিস! এবারে তুই নির্ঘাত মারা পড়বি।



মারা পড়ব?
আলবাত! কোনও সন্দেহ নেই।
এই যে! এখানে, আরও চারটে রাজভোগ।
খাওয়া যা হওয়ার সে তো হল, আমাকে বাঁচাবার মহৎ উদ্দেশ্যে আমার পকেটের নগদ কুড়ি টাকা খসিয়ে এ যাত্রায় প্রাণটা বাঁচিয়ে দিল টেনিদা!
যা যাওয়ার সে তো গিয়েছেই, এবার সটকে পড়া যাক!



অ্যাই প্যালা, পালাচ্ছিস কোথায়?
ন-ন না না, পা...পা পালাচ্ছি না তো। কো...কোথায় পালাচ্ছি!
তবে যে মানিক দিব্যি কাঠবিড়ালির মতো গুটিগুটি পায়ে বেমালুম হাওয়া হয়ে যাচ্ছিলে? আমার সঙ্গে চালাকি?
চালাকি না চলিষ্যতি! তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে এখন।
কোথায়?
দমদমায়।
দমদমায় কেন?
তুই একটা গাধা।
যা ব্বাবা! গাধা হওয়ার মতো কী করলাম?
আর কী করবি? ধোপার মোট বইবি। ধাপার মাঠে কচি-কচি ঘাস খাবি! আজ রবিবার। দমদমায় মাছ ধরতে যাব। এটা কেন বুঝিস না বোকা কোথাকার?
তুমি মাছ ধরতে যাবে তো যাও না, কে আটকাচ্ছে! আমাকে নিয়ে টানাটানি করছ কেন?


তুই যাবি না তো কে যাবে? তুই না গেলে আমার বঁড়শিতে টোপ গেঁথে দেবে কে শুনি?
কেঁচোটেঁচো বাবা আমি হাত দিয়ে ঘাঁটতে পারব না, সে বলে দিচ্ছি।
বাঃ, তুমি মাছ মারবে, আর কেঁচোর বেলায় আমি?
বাগে পেয়েছি! এবারে একটা রফায় আসতেই হবে।
ঠিক আছে! আর ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করতে হবে না। যদি মাছ পাই তবে ল্যাজ থেকে কেটে তোকে একটু ভাগ দেব।
কী বদমাশ লোক! যেন মুড়ো-পেটি আমি আর খেতে জানি না, শুধু ও-ই জানে!



কিন্তু টেনিদার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক চলে না, দেবে একটা চাঁটি হাঁকড়ে!
...আর তা হলেই মাটি নিতে হবে, তারপরে খাটিয়া চড়ে খাঁটি নিমতলা যাত্রা।
গিয়েছি! গিয়েছি!
যাবি কোথায়? আমার সঙ্গে দমদমায় না গেলে তোকে আর কোথাও যেতে দিচ্ছে কে?
প্রায় হাওয়ায় উড়েই ট্রেন ধরে পৌঁছলাম দমদমায়। এর পরে কপালে কী আছে তা একমাত্র টেনিদাই জানে!
এই তো। পৌঁছে গিয়েছি।


কী হল? চল, ভিতরে চল। ওর ভিতরেই মাছ ধরবার বন্দোবস্ত আছে।
খেপেছ? এর ভিতরে মাছ ধরতে যাব কী? ওটা নির্ঘাত ভুতুড়ে বাড়ি।
তোর মুন্ডু।
ওটা আমাদের নিজেদের বাগানবাড়ি, ওর ভিতরে ভূত কোথা থেকে আসবে?
...আর যদি আসেই তো এক ঘুসিতে ভূতের বত্রিশটা দাঁত উড়িয়ে দেব... হুঁ হুঁ! আয়! আয়!


জগা! অ্যাই জগা!
আসুচি।
?!
দাদাবাবু আসিলা?
হুঁ, আসিলাম। এতক্ষণ কোথায় ছিলি ব্যাটা গোভূত? যা, গোটা কয়েক ডাব পেড়ে নিয়ে আয়।
আনুছি।
খান সাতেক ডাব খাওয়ার পর...
সব ঠিক আছে জগা?
হুঁ!
বঁড়শি, টোপ, চার, সব ঠিক আছে?
হুঁ!
তবে যা তুই, আমাদের জন্য খিচুড়ির ব্যবস্থা করগে।
চলে আয় প্যালা, সামনেই পুকুরঘাট।


চল প্যালা, এবার আমরা কাজে লেগে যাই।
নে, কৌটোয় কেঁচো রাখা আছে, বঁড়শিতে কেঁচো গাঁথ!
কেঁচো গাঁথব?
নইলে কি তোর মুখ দেখতে এখানে এনেছি নাকি? ওই তো বাংলা পাঁচের মতো তোর মুখ। ও মুখে দেখবার মতো কী আছে র‍্যা?
সত্যি প্যালা, এখন বেশি বকাসনি আমাকে। মাথায় খুন চেপে যাবে। নে কেঁচো গাঁথ।


আচ্ছা, নে নে, মন খারাপ করিসনি।
মাছ পেলে আমি মুড়োটা নেব, আর সব তোর। ভদ্দরলোকের এক কথা, ঠিক আছে?
নে, এখন বঁড়শিতে কেঁচো গাঁথ।
মাছ তুমি ক'টা পাবে আমার খুব জানা আছে!
মাঝখান থেকে লাভের মধ্যে আমার এই কেঁচো ঘাঁটাই সার!
টেনিদা, মাছ কই?
চুপ।
কথা বলিসনি, মাছ ভয় পাবে।


ও টেনিদা, মাছ কোথায়?
থাম না! কেন বকর-বকর করছিস র‍্যা?
এসব বাবা দশ-বিশ সেরি কাতলার ব্যাপার। এ কী সহজে আসে? এ তো...
টেনিদা!
হেঁইও!
অ্যাঁ, ব্যাটা বেমালুম ফাঁকি দিলে। ঠিক আছে, যাবে কোথায়! নে প্যালা, আবার কেঁচো গাঁথ।
টান দেখেই বুঝতে পারছি কীরকম মাছ উঠবে। মাছ তো উঠবে না, উঠবে জলহস্তী!
কেঁচো গাঁথা কপালে আছে, গেঁথে যাই।


টেনিদা, এবার সামাল।
আর ফসকায়? বারেবারে ঘুঘু তুমি... হুঁ হুঁ।
জয় বাবা মেছো পেতনি!
এবারেও পালাল? উঃ, জোর বরাত ব্যাটার! আচ্ছা দেখে নিচ্ছি, যাবে কোথায়!
আজ ওরই একদিন কি আমারই একদিন! কেঁচো গাঁথ, প্যালা।


কোথায় কী! পরপর গোটা আষ্টেক টানের পর নারকেল গাছটাই প্রায় ন্যাড়ামুড়ো হয়ে গেল। কিন্তু মাছের একটুকরো আঁশও দেখা গেল না।
কী হচ্ছেটা বল দেখি? ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি?
আইজ্ঞা ভুতো নয়, কাঁকোড়া অছি।
কাঁকোড়া? মানে কাঁকড়া?
হুঁ।
তবে আজ কাঁকড়ার বাপের শ্রাদ্ধ করে আমার শান্তি।
বসে-বসে নিশ্চিন্তে আমার চার আর টোপ খাচ্ছে? খাওয়া বের করে দিচ্ছি।
একটা বড় দেখে ডালা বা ধামা নিয়ে আয় তো জগা।


ডালা? ধামা? তাতে কী হবে?
তুই একদম চুপ থাক প্যালা! বকালেই চাঁটি লাগাব।
দৌড়ে যা জগা, ধামা নিয়ে আয়।
এই রে, মাথাটা গিয়েছে বোধ হয়। ধামা নিয়ে পুকুরে নামবে নাকি?
তারপরে যা ঘটল...
আমি বঁড়শি তোলার ঠিক আগে ধামাটা জলের তলায় পেতে ধরবি জগা...
...তারপরে দেখা যাবে কে বেশি চালাক, আমি না ব্যাটাচ্ছেলে কাঁকড়া!


সত্যিকারের একটা শিকারপর্ব বটে। আধঘণ্টার মধ্যে ধামাবোঝাই চল্লিশটা কাঁকড়া। টেনিদার বুদ্ধির কাছে এবারে কাঁকড়ার দল ঘায়েল।
মন্দ কী। কাঁকড়ার ঝোলও খেতে খারাপ নয়। তোর খিচুড়ি কতদূর রে জগা?
কী?
টেনিদা, মনে আছে তো?
মুড়োটা তোমার, আর ল্যাজা-পেটি আমার! ভদ্দরলোকের এক কথা।
অ্যাঁ!
হ্যাঁ।
তা...তা হলে?
তা হলে মুড়ো, মানে কাঁকড়ার দাঁড়া দু'টো তোমার, আর বাকি কাঁকড়া আমার।
সে কী?
ভদ্দরলোকের এক কথা!


তা হলে কাঁকড়ার কি মুড়ো নেই?
ওই দাঁড়াই হল ওদের মুড়ো।
ওদের মুড়ো না থাকলেও মুখ আছে।
কিন্তু সে কথা এখন বেমালুম চাপাই থাক।
ও...হো হো হো! প্যালা, তোর মনে এই ছিল...!
টেনিদা যা খুশি বলুক, বঙ্গেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে কুড়ি টাকার শোক কি আমি এর মধ্যেই ভুলেছি।
আজ দু' দিন বেশ আরামে কাঁকড়ার ঝোল খাচ্ছি। টেনিদা দাঁড়া কীরকম খাচ্ছে ঠিক বলতে পারব না!
...সেদিন রাস্তায় দেখা হয়েছিল, কিন্তু আমাকে দেখেও ঘাড় গুঁজে গোঁ গোঁ করে চলে গেল, যেন চিনতেই পারেনি!

(সমাপ্ত)



চিনি ছাড়ুন মধু খান

আরও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করুন



আপনি কি নিজের অজান্তেই আপনার পরিবারের ক্ষতি করছেন?

সত্যকে চিনির পরত লাগানোর কোন মানে হয় না। চিনি তৈরী হয় কারখানার পদ্ধতিতে, সমস্ত ভিটামিন, মিনারেল, বিভিন্ন এনজাইম এবং অন্যান্য লাভদায়ক পুষ্টিগুলিকে নিঃশেষিত (বার করে দেবার) করার পর।

কিন্তু এর মিষ্টতার জন্যে এটি অত্যন্ত দ্রুত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় আজ 95% জনগণই চিনির প্রতি আসক্ত। চিনিতে কোন জরুরী মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস নেই। বস্তুতঃ চিনি ক্যালোরিতে ভর্তি।

আপনার পরিবারকে দিন ওয়াণ্ডার ফুড (বিস্ময়-আহার)

মধু-কে শুধুমাত্র একটি বিস্ময় আহার বলাই যথেষ্ট হবে না। মধু-কে আপার দৈনন্দিন আহারের অংগ বানিয়ে নিন। আপনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্যে উন্নতি দেখতে পাবেন। মধু আপনার ফিটনেস প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে এবং আপনার অত্যন্ত জরুরী পুষ্টির দৈনন্দিন মাত্রা পূরণ করতে সাহায্য করে।

এতে আছে কপার, আয়রণ, সিলিকয়া, ভিটামিন বি, ম্যাঙ্গানিজ, ক্লোরিণ, ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ফসফরাস, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং অ্যামিনো অ্যাসিড। মধু-তে একটি পরিস্কার অ্যান্টিসেপটিক উপাদান আছে বলে জানা যায়। সেজন্যই গলার সমস্যা কিংবা ফাটা ত্বকের জন্য উপকারী বলে মান্য করা হয়। মধুতে চিনির তুলনায় 1/4 ভাগ কম ক্যালোরি আছে। এর ফলে ওজন কমে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যে উন্নতি ঘটে।

ডাবর হনি - টেস্টিও, হেলজীও

ডাবর হনি হলো চিনির একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প। এতে চিনির তুলনায় 1/4 ভাগ কম ক্যালোরি আছে অথচ মিষ্টতা আছে একই রকম। সবথেকে বড় কথা এতে রয়েছে বি1, বি2, বি5, বি6, সি-র মত গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিনগুলি এবং ক্যালশিয়াম ও আয়রণের মত অত্যন্ত জরুরী মিনারেলগুলিও যা এনার্জি প্রদান করার সাথে সাথে আপনার সম্পূর্ণ পরিবারকে অ্যাকটিভও রাখে।

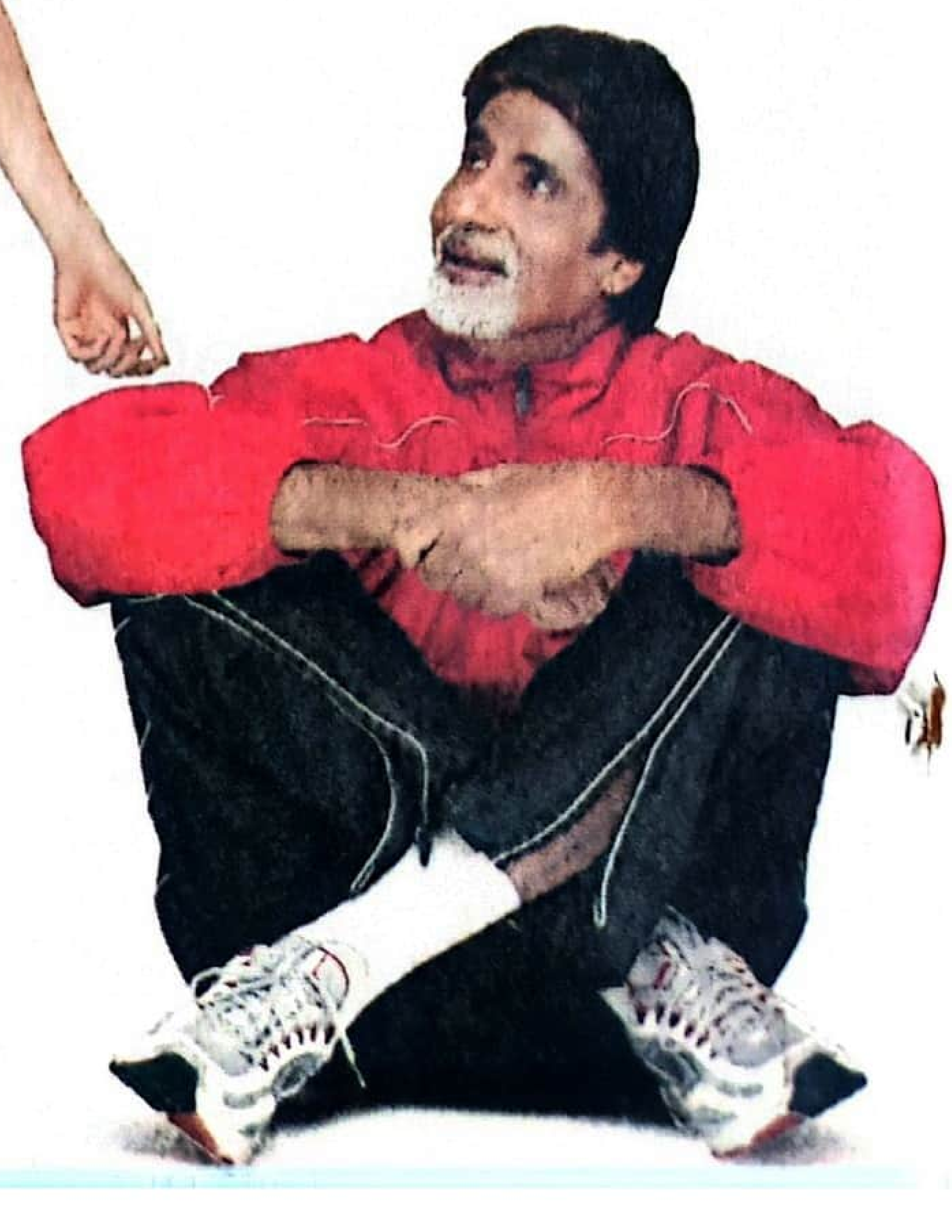
আপনার ছোট্ট সোনার দুধের গ্লাশে মেশান আর তাকে এনার্জিতে ভরে তুলুন। কিংবা রোজ সকলে লেবুর জলে মেশান আর দুর্দান্ত ফিগার তৈরী করুন। এটি রোগ প্রতিরোধ শক্তকে মজবুত করে আর বৃদ্ধি ও বিকাশে সাহায্য করে। সুতরাং ডাবর হনিকে আপনার দৈনন্দিন আহারের একটি অপরিহার্য অঙ্গ করে তুলুন আর আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্য উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করুন।

মধু-র বৈশিষ্ট্যগুলি

মধু সাহায্যে করে

- ওজন কমাতে
- শরীরে এনার্জি ভরে দিতে
- মুখমণ্ডলে লাবণ্য ফুটিয়ে তুলতে
- আপনার রোগপ্রতিরোগ শক্তিকে মজবুত করতে যা এমন ভাবে আর কেউ পারে না।






100%
NATURAL
GUARANTEED PURE
Dabur
চিনিকে মারো ধাক্কা
ডাবর হনি খান
জবরদস্ত এনার্জি পান
চিনির মত নয়, ডাবর হনি অ্যান্টি-অক্সাইডেন্ট, ক্যালশিয়াম ও আয়রণের মত মিনারেল এবং বি1, বি2, বি5, বি6 এবং সি-র মত অত্যাবশ্যকীয় ভিটামিনে সমৃদ্ধ। তাহলে, প্রকৃতির বিস্ময়-আহার যোগ করুন আপনার দুধে আর আপনার শিশুকে ভরিয়ে তুলুন জবরদস্ত এনার্জিতে। আরও চান তো টোস্টে মাখিয়েও খেতে পারেন - আশ্চর্যরকম ফিটনেস পেতে!!
নতুন
Dabur
HONEY
Dabur
HONEY
চিনি নেই। ডাবর হনি। হেলদী আছে। টেস্টি আছে।
ডাবর হনি সম্পর্কে আরও বিশদভাবে জানতে আমাদের ই-মেইল করুন healthnhoney@dabur.com তে, লগ অন করুন www.dabur.com তে
অথবা লিখুন এখানে - ডাবর হনি, ডাবর ইণ্ডিয়া লিমিটেড, পো.অ. বক্স নং 3, সাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদ- 201010 (ইউ.পি.)

প্রতাপগড়ের আততায়ী

অনির্বাণ বসু



ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

রোমাঞ্চকর সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)



আগে যা ঘটেছে: ক্যামাক স্ট্রিটের একটা বাড়ির নাম 'শান্তি আবাস'। সেই বাড়ির সেভেন-বি ফ্ল্যাটে খুন হয়েছেন অজয়কিশোর শর্মা নামে এক ভদ্রলোক। কেউ তাঁকে গুলি করে হত্যা করেছে। খবর পেয়ে ইনস্পেক্টর সৌগত ঘোষ আকিদাকে ফোন করে ডাকলেন। ওই ফ্ল্যাটের মালিক বিদ্যাধর মেহতা থাকেন ভবানীপুরে। তিনি মাস দুয়েক আগে শর্মাজিকে ফ্ল্যাটটা ভাড়া দিয়েছিলেন। কে খুন করল শর্মাজিকে? উত্তেজনায় টানটান উপন্যাসের শেষ অংশ।

একটু চুপ করে থেকে আকিদা বলল, "তুই যখন নিদ্রাদেবীর আরাধনায় নিজেকে মগ্ন রেখেছিলি, তখন আমি এই বিশেষ ওয়েবসাইটে যাই।"

আমি দেখলাম, আকিদা 'ইন্ডিয়া নাউ'-এর সাইটটা খুলেছে কম্পিউটার অন করে।

"ঠিক যা করেছিলাম তখন, এখন আবার করছি, তোর খাতিরে। দেখি, তুই ধরতে পারিস কি না।"

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। ইন্ডিয়া নাউ ম্যাগাজিন যদি কেসটার মিসিং লিঙ্ক হয়, তা হলে তো ওটাই আমার হাতে ছিল। অথচ আমি কিছু বুঝতেও পারিনি!

আকিদা আর্কাইভের ট্যাবটা টিপল। তার মানে পুরনো সংখ্যার হদিশ এই বিশেষ জায়গায় পাওয়া যাবে। আমি ওর পরের প্রশ্নটা আন্দাজে তারিখটা বলে দিলাম, "সিক্সটিন্থ মার্চ।"

অর্থাৎ মার্চ মাসের ষোলো তারিখের সংখ্যায় যেতে হবে। আকিদা তারিখ আর মাস টাইপ করে প্রশ্নটা করল, "ঘটনা?"

কোন বিশেষ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে আজকের ব্যাপার? ঘটনাগুলো সব মনে ছিল না, কিন্তু আকিদা জিজ্ঞেস করতে মনে করার চেষ্টা করলাম। তেলের দাম, প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর, কেরলে বিধানসভা নির্বাচন, কর্পোরেট হাউসগুলোর আপ-ডাউন, শেয়ার মার্কেট, ক্রিকেট...।

"বিহারে খুনোখুনি?" ফিসফিস করে উঠলাম আমি।

দেখলাম, আকিদা নিঃশব্দে ওই খবরের পাতাটা খুলেছে। ইংরেজিতে লেখা খবর আর ফোটো সমেত যখন পুরো খবরটা ডাউনলোড হয়ে মনিটরে ফুটে উঠল, তখন দেখলাম, এক চশমাপরা ছেলের ফোটো। অর্ডিনারি চেহারা, হাল্কা গোঁফ, বাঁ চোখের নীচে জড়ুলের দাগ। নাম অবধেশকুমার। বয়স খুব বেশি হলে পঁচিশ-ছাব্বিশ। পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, আরাহ জেলার পিনচাওয়া গ্রামে এক ব্রিজ তৈরির কাজে যুক্ত ছিলেন তিনি। মার্চ মাসের গোড়ায় কোনও আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। কারণ জানা যায়নি। যদিও প্রাথমিক স্তরে সন্দেহ করা হচ্ছে, কুখ্যাত মাফিয়া কিং চরণপ্রতাপ পান্ডেকে, যাঁর এই ব্রিজ তৈরির ব্যাপারে ঘোর আপত্তি ছিল। পান্ডে ফেরার নন। কারণ, প্রথমত, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই, এবং দ্বিতীয়ত, তিনি বিশ্বাস করেন তাঁর প্রতাপের দরুন সকলে নাকি তাঁর চরণ ছুঁতে ইচ্ছুক। নবাগতরা অবশ্যই এ রীতি পালন করে থাকেন। অবধেশকুমার তাঁর চরণ ছোঁয়া তো দূরের কথা, তাঁর দর্শনও নেননি। এমনকী, তাঁর পাঠানো ব্রিজ না তৈরি করার বার্তা আর তার সঙ্গে পাঠানো সাড়ে তিন লাখ টাকাকে কোনও পাত্তা দেননি। সম্ভবত এ কারণেই ঘটনার সূত্রপাত। এটা অবশ্য জনমত, এবং পুলিশ বলেছে একটা গুলিতে মৃত্যু যখন, তার মানে ভিক্টিমের খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে। এর পর ইনভেস্টিগেশন হয়ে গেলে তারা যা বলার বলবে। চরণপ্রতাপ কড়া ভাষায় এই সংবাদের নিন্দা করেছেন, আসল আততায়ীকে পুলিশ চটজলদি ধরুক এই আশা করেছেন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ সহানুভূতি জানিয়েছেন অবধেশকুমারের পরিবারকে।

অবধেশকুমার অবিবাহিত ছিলেন, এক বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন এবং তিনি বিহারের লোক নন, কর্মসূত্রে আরাহ এসেছিলেন উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড় অঞ্চল থেকে।

"আর কোনও খবর পাওনি, মানে পরের ইসু গুলোয়?"

"নাথিং।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আকিদা। "হয়তো হার্ড কপিগুলোয় আছে, কিন্তু সেগুলো পাই কী করে বল?"

"সেই হিন্দি পত্রিকা?" আমার সঙ্গে-সঙ্গে সেই হিন্দি পত্রিকাটার নাম মনে পড়ে গেল।

"ওটার ওয়েবসাইট নেই।"

"তা হলে?"

হঠাৎ একটা কথা স্ট্রাইক করল আমার। "লায়ন অ্যাজ এমব্লেম?" ফস করে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

আকিদা দু'বার "ও কে, ও কে," বলে তাকাল আমার দিকে। তার মন্তব্যে বুঝলাম আমার প্রশ্ন তার পছন্দ হয়েছে।

"সার্চটাকে ন্যারো করলাম পিনচাওয়া দিয়ে। নাথিং।"

"প্রতাপগড়?" চট করে মনে পড়ে গেল আমার।

"নেগেটিভ।"

"তা হলে?"

"অত চট করে হতাশ হলে চলবে লর্ড বোড়ে?" আকিদা আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বলল।

আমি চুপ। দেখি আকিদা ইন্টারনেটে সার্চ এঞ্জিন থেকে লগ আউট করেনি। ইনপুটের জায়গায় কারসরের দপদপানি দেখে হঠাৎ মনে পড়ল আর-একটা কথা।

"চরণপ্রতাপ পান্ডে?"

আকিদা টাইপ করল। ম্যাচ কাউন্টে বেরোল অনেক সাইট। একটার রং আলাদা। অর্থাৎ আকিদা ওটায় গিয়েছিল।

"যাই খোকনবাবু?"

আকিদা সাইটটায় গেল ঠিকই কিন্তু তাতে আবার 'ইন্ডিয়া নাউ'-এর সাইটে ফিরে গিয়েছে সে। আমি বুঝতে পারছি না, এটায় এত কী পেল আকিদা। পুরো ইনফরমেশন ফুটে ওঠার পর রহস্য উদঘাটিত হল আমার কাছে। 'ইন্ডিয়া নাউ'-ই বটে, কিন্তু ষোলোই মার্চের নয়, এমনকী, তার পরেরও নয়। তার আগেরকার



এবং তাতে চরণপ্রতাপ সম্বন্ধে বলা আছে যে, তিনি এক প্রভাবশালী জমিদার, যাঁর নামে এখনও বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। তিনি একাধারে গোলাপের মতো কোমল এবং পাথরের মতো নির্মম। যদিও তাঁর চেহারা পাহাড়ের মতো বড়, তাঁর মন নাকি শিশুর মতো নির্মল এবং দূরদিগন্ত থেকে লোকে তাঁর দর্শনের জন্য তাঁরই তৈরি ধরমশালায় রাত্রি যাপন করে। তাঁর নৌকোয় নদী পেরিয়ে তাঁকে দর্শন করে চরিতার্থ হয়। কিছুদিন আগে বেনারসের স্বনামধন্য কুস্তিগির গাঠিয়াবাবার পেয়ারের চেলা যোগিন্দররাজ তাঁর সামনে নিজের পালোয়ানগিরি দেখিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। গভর্নমেন্টের লোকজনও আসেন তাঁর কাছে, তাঁদেরও হেল্প করে থাকেন।

"হঠাৎ 'ইন্ডিয়া নাউ'-এর উপর একটা লেখা বের করল কেন বলো তো? আর তারপরে যখন অবধেশকুমার খুন হন তখন সেই পত্রিকা আবার তাঁকে মাফিয়া বলছে?"

"আমার মনে হয় নিজের আসল ইমেজ ঢাকার জন্য একটা রিপোর্ট বের করেছিলেন তিনি নিজের সম্বন্ধে। কন্ট্রাক্টস আছে, না হলে গভর্নমেন্টের আর মিডিয়ার লোকেদের হাত করেন!"

"কী করে বলছ?"

"কী করে আবার?" ঝাঁঝিয়ে উঠল আকিদা। "অবধেশকুমার খুন হওয়ার পর তাঁর সম্বন্ধে পরে আর কোনও কথাই লিখল না 'ইন্ডিয়া নাউ'। পুরো ব্যাপারটা হাস আপ করেছে। আর এতে চরণপ্রতাপ পান্ডের নির্ঘাত হাত আছে। গভর্নমেন্ট আর মিডিয়া, এদের হাতে রাখতেই হয়, না হলে এ জিনিস সম্ভব নয়। আসলে কী বল তো, 'ইন্ডিয়া নাউ'-এর প্রথম রিপোর্টটাই বুমেরাংয়ের মতো কাজ করেছে চরণপ্রতাপের উপর।"

দেখি, ও এবার চরণপ্রতাপ পান্ডে টাইপ না করে নামের ইনিশিয়াল টাইপ করেছে। চরণপ্রতাপ পান্ডে নয়, সি পি পান্ডে।

ভাবলাম, যদি আরও কিছু ইনফরমেশন পাই এই রঙিলা ক্যারেকটারের উপর। কিন্তু যা পেলাম তা হল...।

আর-একটা ইনফরমেশন ফুটে উঠল কম্পিউটার মনিটরের উপর। ফোটো সমেত পুরো ইনফরমেশন দেখে আপনা-আপনিই আমার মুখ দিয়ে এক বিস্ময়সূচক আওয়াজ বেরিয়ে পড়ল।

"ফার্স্ট টাইম লাকি," বলল আকিদা। আর তা হবে নাই-বা কেন? এ অন্য, নাম চন্দ্রপ্রকাশ পান্ডে, সাসারামের কাছে প্রকাশগড় নামে এককালের প্রিন্সলি স্টেটের মালিক। ব্রিটিশ রাজত্বে তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিল, সাহেবদের সঙ্গে পোলো খেলতেন তিনি। একবার খেলতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে তাঁর ডান পায়ে চোট লাগার ফলে তাঁকে... আমার পড়ার আর দরকার নেই। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এক রাজকীয় চেহারার পুরুষ, মাথায় জবরদস্ত পাগড়ি, প্যাঁচানো পাকা গোঁফ, একটা ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে ক্রিম রঙের শেরওয়ানি এবং তাতে যে বোতাম লাগানো তার একটা যে আকিদার হস্তগত সেটা আর না বলাই ভাল। আমার বলরামের কথাটা মনে পড়ে গেল, সাসারাম। চন্দ্রপ্রকাশও ওদিককার, ক্রাচ ব্যবহার করেন। আকিদা আর আমি দু'জনেই আওয়াজ পেয়েছি, আকিদা ধরতে পেরেছে, আমি পারিনি। এই ভিত্তিতে আকিদা ধাওয়া করেছে ওঁদের পিছনে! অজয়কিশোর শর্মার খুনি তা হলে এঁরা? খুনের কারণ? জিজ্ঞেস করতে আকিদা বলল, "সেটা জানতেই তো খোঁচা মারা।"

দেখি, আকিদা একদৃষ্টে চন্দ্রপ্রকাশের ফোটোটার দিকে তাকিয়ে আছে। এত কী দেখার আছে? এর পর দেখি, ফোটোটা নিজের হার্ড ডিস্কে ডাউনলোড করে একটা প্রিন্টআউট বের করে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল।

তারপর প্রায় মিনিটখানেক পর ফিসফিস করে বলল দু'টো কথা, "গুড গড!" একটা হতাশার আভাস তার গলায়, কিন্তু সেটা কেন তা বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করার সময়ও নেই। কারণ, টেলিফোন বেজে উঠেছে।

সেই আদি এবং অকৃত্রিম সৌগতবাবু। সেই গলা। তবে এবারে জাঁদরেল টু দ্য পাওয়ার ইনফিনিটি। কারণ, আকিদার কাছ থেকে কোনও ইনফরমেশন নেই, কিন্তু ওঁর কাছে আছে। এক, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট। "ভিসেরায় কড়া ডোজের মাদক পাওয়া গিয়েছে স্যার।" শুনে আকিদা তাকাল আমার দিকে।

দুই, বলরাম। "সে বিহারের সাসারামের কাছে প্রকাশগড় নামে এক হাফ রাজ্যের অধিবাসী। এখন গয়া গিয়েছে তীর্থ করতে। কী তীর্থ, কোথায় তীর্থ, সব তো জানা। যদি বলেন তো... এঃ, ধরবই বা কী করে। হতভাগা ভবেশটার জন্য...।"

আকিদা টক করে হ্যান্ডসেটটা তুলে নেওয়ায় আমার আর বাকিটা শোনা হল না। শুধু আকিদার কথাই শুনতে পেলাম, "চরণপ্রতাপ আর চন্দ্রপ্রকাশ। দু'জনেই পান্ডে। একজন পিনচাওয়া, আরাহ্, বিহার। আর-একজন চন্দ্রপ্রকাশ, সাসারাম, বিহার। এঁদের দু'জনের ইনফরমেশন চাই কাল দুপুরের মধ্যে, ও কে। তা ছাড়া কাল কিন্তু আপনি বিদ্যাধর মেহতাকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে নেবেন। শর্মাকে ফ্ল্যাটটা ভাড়া দিলেন কেন, সেটা জানতে হবে। তা হলে ওই কথাই রইল। ভাল কথা, মিস্‌ড কল দিতে পারি। পেলেই শান্তি আবাসে চলে আসবেন।"

"সো ফার সো গুড।" বলল আকিদা।

আমার মাথার মধ্যে একটা প্রশ্ন বারবার খোঁচা মারছে। আকিদার ভাষায় 'কে' অর্থাৎ খটকা আমার মনে অনেক, কিন্তু যাকে বলে প্রাইম 'কে' একটাই। খুন যদি বলরাম আর চন্দ্রপ্রকাশ করেই থাকেন, তা হলে এঁরা পালালেন না কেন? আকিদাকে প্রশ্ন করতে যা জবাব পেলাম, তা হল, "আমার মনে হয় ওঁরা পালালে সন্দেহ একেবারে তৎক্ষণাৎ ওঁদের উপর গিয়ে পড়ত। তা ছাড়া দু'টো মারাত্মক প্রমাণ তো ওঁরা উদ্ধার করতে পারেননি।"

"কী?"

"কত বার একটা কথা বলতে হবে? ম্যাগাজিন আর বোতামের কথা ভুলে গেলি নাকি?"

তারপর কম্পিউটার শাটডাউন করে বলল, "আমার মনে হয় পুলিশের ঝামেলা মিটলে ওঁরা প্ল্যান করছিলেন জিনিসগুলো উদ্ধার করে আনবেন। আমি গিয়ে বোতামটা তুলে আনলাম, তারপর ওঁদের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম, থ্যাংকস টু ইন্টারনেট।"

আকিদা মিনিটখানেক আমার দিকে একেবারে সটান তাকিয়ে রইল। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলল, "কুরুক্ষেত্রে একটা সান্ধ্য ভিজিট মারলে কীরকম হয়?"

"দিস ইজ ফাইন," ফিসফিস করে বলল আকিদা। আমরা হট স্পটে এসেছি মিনিট পনেরো হল। সাড়ে দশটা বাজে। আমার

ধারণা ছিল না ক্যামাক স্ট্রিটের মতো জায়গা, যেটা বিকেলে এত গমগম করছিল, রাত্তির সাড়ে দশটায় এত শুনশান হয়ে যাবে? দু'-একটা গাড়ি বা ট্রাকের আওয়াজ ছাড়া আর কোনও কিছুর আওয়াজ পাচ্ছি না এবং এগুলো চলেও যাচ্ছে খুব স্পিডে। হঠাৎই রাতের থমথমে ভাবটাকে ভেদ করে একটা আওয়াজ, সেটা বাড়ল, মিলিয়ে গেল, আর তারপর চুপচাপটা যেন আরও চেপে বসল। আমাদের এখন এই চুপচাপের মধ্যে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে হবে। কতক্ষণ জানি না। আমরা মানে আকিদা, আমি ও সৌগতবাবুর এক সেকেন্ড ম্যান, নির্মল সেন। চুপিসাড়ে শর্মার ফ্ল্যাটে ঢুকে আলো না জ্বালিয়ে ম্যাগাজিনগুলো তুলে নিয়েছি। আকিদা সেগুলোকে সৌগতবাবুর হাতে তুলে দিতে বলল। তারপর শর্মার ড্রয়িংরুমের লাগোয়া কিচেনের দরজাটা বন্ধ করে সামান্য ফাঁক রেখে আমরা বসে রইলাম। আর সেনবাবু আকিদার কথামতো ফ্ল্যাটের দরজাটা বাইরে থেকে লক করে পরের দিন ভোর পাঁচটার সময় আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন। ভদ্রলোক 'হ্যাঁ স্যার, না স্যার' বলে কাজ সারলেন।

"আমরা তো বেরোতে পারব না।" দরজা লক করার আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে আমি বলে উঠলাম।

"চেঁচাচ্ছিস কেন?" গ্লাভস খুলে আকিদা ঘরের মেঝেয় হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল। "থাক না বসে চুপ করে। লাইফে সবরকম অভিজ্ঞতা হওয়া দরকার।"

"কিন্তু...।"

"হয় কাল সকালে পুলিশ এসে উদ্ধার করবে, নয়তো...।"

আকিদার কথা থেমে গেল। আমি জানি কেন। একটা আওয়াজ কানে এসেছে। দরজা খোলার আওয়াজ নয়। সকালে যে আওয়াজটা পেয়েছিলাম, সেটাই। খেয়াল করিনি, আকিদা করেছিল, রাত্তির বলেই। আর আকিদা বলার দরুনই আওয়াজটা যেন বেশি করে কানে লাগল। কেউ একজন হাঁটছে ক্রাচে ভর দিয়ে। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ, তারপর এক রাম ধমক, "চোপ!"

তারপর আবার সব চুপ। এর পর আবার পায়চারির আওয়াজ। আমাদের কথাবার্তা সব চাপা গলাতেই চলল।

"আর্গুমেন্ট হচ্ছে।" নির্বিকারভাবে বলল আকিদা। "আমাদের নিয়ে মনে হয়।"

"কে... কেন?"

"আমরা ওঁদের স্ট্র্যাটেজি গুবলেট করে দিয়েছি যে! বাইরে পুলিশ পাহারা, পালাবার উপায় নেই, কার্টসি সৌগতবাবু।" শুনে আমার বেশ ভাল লাগল। "যদিও শ্রেফ একটা ভ্যান আছে এবং তাতে ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই।" পকেট থেকে দু'টো টফি বের করে বলল আকিদা।

"তা... তা হলে?"

"আরে সেটা তো ওরা জানে না। এই রাতে যদি ওরা বেরোতে চায়, চারবার ভাববে। যদি বেরোয়ও, ভ্যান ওদের ফলো করবে। যদি হাওড়া, শিয়ালদা বা এয়ারপোর্টের দিকে...।"

নিস্তব্ধতা যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। রাত কত হল? একচিলতে আলোয় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, এগারোটা বাজে। তার মধ্যে আবার কী একটা খসখসে ব্যাপার আমার হাতে এসে লাগতে রীতিমতো চমকে তাকিয়ে দেখি, দু'টোর মধ্যে একটা টফি আকিদা আমার হাতে গুঁজে দিয়েছে।

"আর কোথাও যাবে না।" টফি মুখে দিয়ে বলল আকিদা। "অচেনা শহর, খুনের মামলায় জড়িয়েছে নিজেদের, ক্লু উদ্ধার করে শ্রেফ পালাবার চেষ্টা করবে।"

"এসব তুমি কখন অর্গানাইজ করলে?"

"তুই যখন তৈরি হচ্ছিলি, তখন।"

আমি বুঝলাম, আকিদা দাবা খেলার মতো একটা চাল চেলেছে। চিন্তার কোনও কারণ নেই। টফি মুখে দিয়ে বেশ ভালই লাগল। "ওঁরা কি সত্যিই খুন করেছেন?"

"তুই না হয় ওঁদের জিজ্ঞেস করে নিস।" কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিল আকিদা। ওই সরু আলোয় আমি ওর চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না।

"কিন্তু কেন?" বেশ কিছুক্ষণ পর, আবার চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"মোটিভ একটা আন্দাজ করছি আমি, কিন্তু সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর হওয়ার জন্যই এখানে আসা। না হলে তো সৌগতবাবুকে বলে ম্যাগাজিনগুলো তুলে নিলেই হত। তা ছাড়া...।" আমার দিকে তাকিয়ে বলল আকিদা, "যখন তাঁরা তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সঠিক জায়গায় পাবেন না এবং সেটা হবে আমারই জন্য, তখন তাঁদের রিঅ্যাকশন দেখা এক লোভনীয় মুহূর্ত। সে দৃশ্য ফেলে বাড়িতে বসে থাকি কী করে?"

রাত বেশ ভালই হয়েছে। গাড়ির আওয়াজ ক্রমশ কমে আসছে। শর্মার ফ্ল্যাটের দরজা-জানলা বন্ধ, এমনিতেই চুপচাপ, নিস্তব্ধতা যেন বেড়েই চলেছে।

"এবার তুই একটু চোখটা বন্ধ করে রেস্ট নে।" নিজের গ্লাভসগুলো পরতে-পরতে বলল আকিদা।

ওর দেখাদেখি আমিও কাজটা সারলাম। গ্লাভস পরা থাকলে আঙুলের ছাপ কোথাও পড়বে না। যদি হাতাহাতি হয়, তা হলে প্রাথমিক চোটটাও কম লাগবে। আকিদা আর কিছু এনেছে কি না জিজ্ঞেস করতে বলল, "সুইস পেন নাইফ।"

বুঝলাম, প্রশ্ন করা বৃথা, ও যা বলছে তাই চেষ্টা করে দেখি। ঠিক সময় ঠেলা খাব। ঠেলা খেলাম ঠিকই, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই, তবে ঠিক ঠেলা নয়, একটা প্রশ্ন, "উপরের ফ্ল্যাটটা কার জানিস?"

আমাকে মাথা নাড়তে হল। কারণ, এটা জানা সম্ভব নয়।

"বিদ্যাধর মেহতা হিমসেল্ফ।"

"মানে?"

"আস্তে।" আকিদার হিসহিসে গলা পেলাম। "তুই কি গোটা শান্তি আবাসকে ওঠাবি নাকি?"

আকিদার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও জানল কী করে?

"ভিজিটর্স বুকের পাতা উলটে। আজ সকালে পাতা ওলটাতে-ওলটাতে জিনিসটা আমার চোখে পড়ে। তখন খেয়াল করিনি। এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা কত সিগ্‌নিফিক্যান্ট।"

আমি অন্ধকারে বসে ভাববার চেষ্টা করলাম। বিদ্যাধর মেহতার দু'টো ফ্ল্যাট। নিজে যখন ভবানীপুরে থাকেন, তা হলে নিশ্চয়ই দু'টোকেই ভাড়ায় দিয়েছেন। কিন্তু কেন? উনি কি জানতেন যে, এরকম একটা কাণ্ড হবে? তা হলে দিতেন না নিশ্চয়ই। উনি আবার এখন সিঙ্গাপুরে। আর এখনই কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল। যতই এটা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম, ততই মনে হতে লাগল যে, চন্দ্রপ্রকাশ আর বিদ্যাধর একই দলের লোক এবং এঁদের মধ্যে একজনকে ধরলেই কেল্লা ফতে। আকিদা কী



প্ল্যান করছে জানি না। কতক্ষণ এই অন্ধকারে হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকতে হবে তাও জানি না। মিশন সাকসেসফুল হবে কিনা তাও জানা নেই। কিন্তু আমি জানি যে, আর কিছু না হোক, কাল সৌগতবাবু বিদ্যাধরকে ধরে বিদ্যা বের করার ব্যাপারে কোনও রকম গাফিলতি করবেন না।

ঢুলুনিটা কেটে গেল আকিদার এক ঠেলা খেয়ে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই কিন্তু এক ঠেলাতেই আমি সজাগ। চোখ মেলতেই আওয়াজটা কানে এল। চারদিক নিশ্চুপ বলেই বোধ হয়। সেনবাবু কোলাপসিবল টেনে লক করে দিয়েছিলেন, এবার সেটা খোলার আওয়াজ পেলাম। কীর্তিটা যে খুব সন্তর্পণে হচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

"তালা ভাঙার আওয়াজেই আমার তন্দ্রা কাটল।" ফিসফিস করে বলল আকিদা। দেখি, পকেট থেকে একটা তালা বের করেছে। বেশ ভালই সাইজ। আশ্চর্য! খেয়াল করিনি কখন নিয়ে এসেছে। কী প্ল্যান করছে ও? দরজার ল্যাচ-কি খোলার আওয়াজে দেখি, আকিদা একেবারে আমাদের হাইডআউটের দরজার কাছে। আমার আর ওর একই পোশাক, কালো টি-শার্ট, কালো জিনসের প্যান্ট, গাঢ় রঙের স্নিকার। তবে ওর চেহারা একেবারে টানটান। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখলে মনে হচ্ছে প্যান্থারের মতো লাফ মারতে পারে। দরজাটা এবার খুলে গেল। দু'টো ছায়ামূর্তি ঢুকছে।

দমবন্ধ করলাম। ভয়ে নয়, দরকারে। একটা আনওয়ান্টেড আওয়াজ সব কিছু এদিক-ওদিক করে দিতে পারে। ছায়ামূর্তি দু'টো এবার টেবিলের দিকে এগোল। ওখানেই ছিল ম্যাগাজিনগুলো। এখন সেগুলো সৌগতবাবুর জিম্মায়। আকিদার জন্যই। ওর আন্দাজ যে কত জোরালো এবার বুঝলাম।

আমি আকিদার কাছে চুপিসাড়ে এগিয়ে গেলাম। ওর নিশ্বাসের আওয়াজ পাচ্ছি না। বন্ধ রেখেছে নির্ঘাত। ও কতক্ষণ রাখতে পারবে জানি না, আমি মিনিট খানেকের মতো পারব।

"গিয়া কাঁহা?" একটা অবিশ্বাস মেশানো চাপা অস্ফুট স্বর।

গলা চিনতে অসুবিধে হল না। বলরাম। ম্যাগাজিনগুলো ও-ই জানে, কোথায় ছিল। এখন নেই। তার মানে খুনের সময় ও ছিল।

"ও লম্বু লে লিয়া জরুর।" অচেনা গলা।

"হাত খালি কি?"

"না। রিভলভারধারী।"

আকিদাকেই যে ঠাউরেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আকিদার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, তার মধ্যে কোনও চেঞ্জ নেই। উপভোগ করছে কি না জানি না। আমি মোটেই...।

"ক্যাঁচ।"

ভাবতে পারিনি আমাদের হাইডআউটের দরজাটা চরম সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। আকিদাকে বলতে শুনেছি, চ্যালেঞ্জকে অপরচুনিটি হিসেবে ভাবতে। তার প্রমাণ পেলাম।

ওইটুকু আওয়াজে যে সামান্য অন্যমনস্ক হয়েছিল তারা, সেই সময় আকিদা ঝড়ের মতো ঝাঁপাল ওদের উপর। প্রায় তৎক্ষণাৎ আমি। একটা ঘুসি মারতে গেলাম বলরামের চোয়ালে। কিন্তু দেখলাম, চকিতের মধ্যে তার মাথা সরে গেল। এবং তার কারণ সে নয়, আকিদা স্বয়ং। নিজের হাত দু'টোকে বাজপাখির মতো ছড়িয়ে ডান হাতের তালা দিয়ে রিভলভারধারীর মাথায় মোক্ষম আঘাত, আর বাঁ হাতে বলরামকে ঘাড় ধরে টেনে তার মাথার সঙ্গে রিভলভারধারীর মাথায় ঠোক্কর। দু'জনেই নেতিয়ে পড়ল। বলরাম গোঙাচ্ছিল, আকিদার একটি আপার কাটে সে চুপ করে গেল। আকিদা এবার দু'জনেরই গলার কাছে হাত রেখে পাল্স দেখে একটা শ্বাস নিয়ে বলল, "ঠিক আছে। ঘুমোক ব্যাটারা।"

আমি রিভলভারটা কুড়িয়ে নিলাম। বেশ ভারী।

"দে আমাকে।"

রিভলভার থেকে গুলি বের করে দু'টোকে পকেটস্থ করে বলল, "শর্মার শরীরে যে বুলেট সেটা তার কার্তুজসুদ্ধ ঢুকেছে। এ গুলির কার্তুজটা দরকারি প্রমাণ। একটাই গুলি ছিল।"

তারপর আপন মনে বলল, "বয়স্কদের উপর এভাবে হামলা করতে ভাল লাগল না। কিন্তু পাড়া না জাগিয়ে কাজ সারার আর কোনও রাস্তা ছিল না আমার কাছে।"

আমি তালাটা কুড়িয়ে ওর হাতে দিলাম।

"চল এবার।"

"কোথায়?"

আকিদা আমার প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আমিও গেলাম ওর পিছন-পিছন। সেভেন বি-র বাইরে এসে প্যাসেজের আলোয় তালাটাকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "যাক, রক্ত লাগেনি।" তারপর গ্লাভসপরা হাতে দরজাটা বন্ধ করল। ভাঙা তালাটা সরিয়ে কোলাপসিবল গেটটাকে সন্তর্পণে পুরো টেনে দিল। নতুন তালা দিয়ে লক করে ভাঙা তালাটাকে ঝুলিয়ে বলল, "এন্ড অফ প্রথম চ্যাপ্টার।"

"দারুণ হল কিন্তু! খুব চটপট আর একেবারে সাইলেন্টলি।"

"গ্লাভসটা পরে থাক। আরও কাজ আছে।" সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে বলল আকিদা।

এইট বি-র দরজার সামনে পৌঁছে, কিছুক্ষণের জন্য কী চিন্তা করল আকিদা। ঘড়িটা দেখে নিলাম এই ফাঁকে। তিনটে বাজে। ঝটাপটির পরও অক্ষত আছে।

"অনেক অ্যাকশন সিনেমা তো দেখিস," ফিসফিস করে বলল আকিদা, "এবার কাজে লাগা তো দেখি।"

আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। এবার কী? আকিদা এবার গুলিবিহীন রিভলভারটা আমার হাতে চালান করে দিয়ে বলল, "দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়া। যে দরজাটা খুলবে তাকে মেনাসিং লুক দিয়ে তার কপালে স্ট্রেট পয়েন্ট করবি।"

"কিন্তু এতে তো গুলি নেই।" আমি জবাব দিলাম।

" সেই জন্যই তো তোকে দিচ্ছি। যে খুলবে সে তো জানবে না। নে ধর।"

জীবনে প্রথম রিভলভার ধরলাম। গুলিবিহীন, তাই সই। কিন্তু তাতে মনে হল, হাতে আমার এক্সট্রা পাওয়ার চলে এল। মেনাসিং লুক বা রক্তহিম করা চাউনি দিতে অসুবিধে হবে না।

দরজাটায় নক করার আওয়াজ পেলাম। দেখি, আকিদা নক করে ঠিক দরজার ম্যাজিক আইয়ের তলায় ঘাপটি মেরে বসে পড়ল। এবার ওর প্ল্যানটা বুঝতে পারলাম। ম্যাজিক আই দিয়ে ওকে দেখা যাবে না, আর দরজা একবার একটু ফাঁক হলেই ও নিচ থেকে মারবে ঠেলা, আর আমাকেও রিভলভার নিয়ে...।

দরজাটা খুলতেই আমি ঝপাং করে একেবারে হলিউডি



সিনেমার মতো দু' হাতে রিভলভার নিয়ে ভিকটিমের দোরগোড়ায়। অবশ্য নলটা ঠিকমতো পয়েন্ট না হওয়ায় সেটা গিয়ে ঠেকল তাঁর নাকের কাছে। কিন্তু ওতেই যথেষ্ট। তিনি কী বা কাকে এক্সপেক্ট করছিলেন জানি না, কিন্তু আমাকে দেখে তাঁর দৃষ্টি হল বিস্ফারিত। তবে তা রইল কয়েক মুহূর্তের জন্য এবং তার পরেই হয়ে গেল ঘোলাটে। কারণ আকিদা। যা ভেবেছি ঠিক তাই। আকিদা ভিকটিমের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে একেবারে ফুলফোর্সে দরজা দিয়ে মেরেছে ঠেলা। তারই ধাক্কায় প্রথমজন টাল সামলাতে না পেরে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে একেবারে অজ্ঞান। উপস্থিত বুদ্ধি আর টিমওয়ার্ক দিয়ে আজ নিঃশব্দে তিনজনকে ধরাশায়ী করেছি, তার মধ্যে একজন অস্ত্রধারী।

"দরজাটা বন্ধ করে দে।" আকিদা আমার কাছ থেকে রিভলভার নিয়ে নিচু হয়ে পাল্‌স দেখতে শুরু করল। দরজাটা বন্ধ করার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে একটা আওয়াজ। এ আওয়াজ আমাদের অত্যন্ত চেনা। এই আওয়াজের সূত্র ধরেই আজকের কাণ্ডকারখানা এবং ফ্ল্যাটের হাল্‌কা আলো ভেদ করে আমাদের দিকে ক্রাচে ভর দিয়ে যিনি এগিয়ে আসছেন, তাঁর সঙ্গে আজই আমাদের পরিচয় হয়েছে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

চন্দ্রপ্রকাশ পান্ডে। প্রকাশগড় নামে এককালের প্রিন্সলি স্টেটের মালিক। সেই রাজকীয় চেহারার পুরুষ, প্যাঁচানো পাকা গোঁফ, মাথার সমস্ত চুল ধবধবে সাদা, পরনে সাদা সিল্কের পাজামা-পাঞ্জাবি। গোটা চেহারায় এক আভিজাত্য মিশ্রিত হিংস্র ভাব যেন আমাদের খেয়ে ফেলবে। রক্তহিম করা চাউনি কখনও দেখিনি, এবার দেখলাম। আমার হাত যেন দরজার ল্যাচ-কিতেই আটকে গেল। আকিদাকে দেখি, সে এক দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। রিভলভারটা কোথায়? ওর পকেটে নিশ্চয়ই। কেন জানি না, মনে হচ্ছে, এ জিনিসটা এখানে কাজে দেবে না। তার কারণ, চন্দ্রপ্রকাশ তাঁর বার্ধক্য এবং অসুস্থতাকে পরোয়া না করে যেভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন, তাতে মনে হচ্ছে, কেউই তাঁকে থামাতে পারবে না। এখানে বলপ্রয়োগ করাটা বোকামি। অন্য কিছু করতে হবে। চন্দ্রপ্রকাশ এবার পায়ে-পায়ে আকিদার দিকে এগিয়ে এলেন। আকিদা একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভাবভঙ্গিতে এক মারাত্মক কনফিডেন্স। বোধ হয় ওটাই আমাকে ভরসা জোগাল। আমি চট করে একবার পিছনে দেখে নিলাম। আমাদের তিন নম্বর ভিকটিম এখনও অজ্ঞান।

চন্দ্রপ্রকাশ এবার একেবারে আকিদার সামনে এসে দাঁড়ালেন। খেয়াল করলাম, উনি আকিদার মতোই লম্বা। এবার রক্তহিম করা চাউনির সঙ্গে যুক্ত হল হুঙ্কার, "গেট আউট।"

কয়েক সেকেন্ডের জন্য আকিদা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এর পর ধীর অথচ দৃঢ় গলায় শুনলাম তার উত্তর। প্রশ্ন করল আকিদা ইংরেজিতেই। যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, "অবধেশকুমার তোমারই পুত্র, নয় কি?"

চন্দ্রপ্রকাশের বাঁ হাতটা উঠেছিল, সেটা এবার আস্তে-আস্তে নামতে শুরু করল। লক্ষ করলাম, চন্দ্রপ্রকাশের কব্জি বেশ চওড়া। এবার তাতে একটা কাঁপুনি যোগ হল। কাঁপুনি না বলে 'থরথর' বলাই ভাল। সত্যি বলতে কী, আকিদা যদি ওঁকে না ধরত, উনি হয়তো পড়েই যেতেন।

আকিদার এক ইশারায় আমি আর আকিদা ওঁকে ধরাধরি করে একটা সোফায় বসালাম। চন্দ্রপ্রকাশের চাউনিতে আর সেই রক্তহিম করা ভাবটা নেই। আছে এক উদাস দৃষ্টি। বুঝলাম, আকিদা একেবারে মোক্ষম চাল চেলেছে। ও বুঝল কী করে?

"ইন্ডিয়া নাউ'-এর ওয়েবসাইটে অধেশকুমারের ফোটোর সঙ্গে তোমার ফোটোর মিলটা আমার চোখে পড়ে। পাগড়ি পরা ছিল তাই কপালের পাশে জড়ুলটাও চোখে পড়েনি। এখন এই মিলটা আমার সন্দেহকে আরও জোরদার করল।"

"মুন্নার কাণ্ড," নিটোল ইংরেজিতে জবাব দিলেন চন্দ্রপ্রকাশ।



ওঁর সাহেবি উচ্চারণ তারিফ করার মতো। "আমার উপর ইনফরমেশন কম্পিউটারে ও-ই তৈরি করে। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে এই ছিল তার প্রথম কাজ। আমি ছেলেকে কেমব্রিজে পাঠিয়েছিলাম পড়াশোনা করতে, যা আমি করেছিলাম।"

"তারপর?"

চন্দ্রপ্রকাশ আকিদার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে একটা কঠিন ভাব দেখা দিয়েছে। এর পর প্রশ্নটা এল চোস্ত হিন্দিতে, যাতে একটা ভোজপুরি টান রয়েছে। "সেটা জেনে কী হবে তোমার? আমার কাছ থেকে সব জেনে নিয়ে তোমাদের ঝুটা পুলিশ ফোর্স বাহবা কুড়োবে?"

"আই অ্যাম নট ফ্রম দ্য পুলিশ।" উত্তর দিল আকিদা।

"বন্ধ করো বকওয়াস।" চন্দ্রপ্রকাশের গলায় একটা তীক্ষ্ণ ভাব দেখা দিয়েছে। "তোমরা যেভাবে আমাকে কর্নার করেছ, সেটা পুলিশের ট্রেনিং ছাড়া...।"

চন্দ্রপ্রকাশের কথা আটকে গেল। কারণ, আমি। বুঝলাম, উনি প্রথম আমাকে, যাকে হিন্দিতে বলে 'গৌর সে দেখনা', তাই করছেন। আমাকে দেখে হয়তো ওঁর মনে হয়েছে যে, আর যাই হোক, আমার বয়সি ছেলে পুলিশে চাকরি করতে পারে না।

আকিদা তৎক্ষণাৎ এই সিচুয়েশনের সদ্ব্যবহার করল। "মাই ব্রাদার। মিস্টরি সল্ভিং আর বিপদ নিয়ে খেলা আমাদের হবি।"

"ইয়ং ম্যান, আমি এককালে যেভাবে ডেঞ্জার নিয়ে খেলেছি, তা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না।" চন্দ্রপ্রকাশের গলা রীতিমতো পালটে গেল, "খোঁড়া পায়ে, হাতির পিঠ থেকে নেমে চিতাবাঘ শিকার করেছি, ফর ফান, পঞ্চাশ বছর বয়সে।"

"ওটা আইন বিরুদ্ধ।" ঠান্ডা গলায় বলল আকিদা।

"আইন?" চন্দ্রপ্রকাশের গলায় আবার সেই হুঙ্কার, "কৌন কানুন? যে দেশের আইনে দোষীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, সেটা কি আইন না প্রহসন?"

"দোষী তো আপনিও।" আকিদার গলায় কোনও চেঞ্জ নেই।

"ইয়েস।" দাঁতে দাঁত চেপে উত্তরটা এল। চন্দ্রপ্রকাশ এবার উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ করলাম, তাঁর চোখে এক বিদ্বেষ মেশানো চ্যালেঞ্জের দৃষ্টি। "এক সময় মেরেছি ফর ফান, এখন মারলাম প্রতিশোধের জন্য।"

"আইন হাতে নিতে পারেন না আপনি।" আকিদার গলায় একটা হিসহিস ভাব।

আকিদার ওই একটা কথায় চন্দ্রপ্রকাশ কীরকম পালটে গেলেন। তাঁর চোখে আবার এক উদাস দৃষ্টি দেখা দিয়েছে। "মুন্না ঠিক একই কথা বলত।" গলাটা ধরে গেল। বসে পড়লেন তিনি।

রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে দূর থেকে একটা ট্রাকের আওয়াজ ভেসে এল। আমি একবার পিছন ফিরে দেখে নিলাম। তিন নম্বর ভিকটিম একটু-একটু নড়ছে। আকিদাকে ইশারা করতেও তেমন আমল না দিয়ে চন্দ্রপ্রকাশের দিকে তাকাল। উনি মাটির দিকে তাকিয়ে আছেন। এবার তাঁর স্বর শুনতে পেলাম। মনে হল যেন অনেক দূর থেকে আসছে সেটা।

"মুন্না ছিল বর্ন রিবেল। ও চেয়েছিল আমুল পরিবর্তন আনতে, একেবারে গ্রাসরুট লেভেল থেকে। বললাম, আমার এখানে কর কী করবি। শোনেনি। বলেছিল, আমার এখানে ওর নিজের কোনও আইডেনটিটি থাকবে না। নামের পদবি ড্রপ করল। আমাদের অনেকেই করে সেটা। আপত্তি করিনি। চাকরি নিল, ঘর ছাড়ল। তাও কিছু বলিনি। শেষে যখন আমাকে জানাল চাকরিস্থলের এক চক্রান্ত ফাঁস করতে চায়। আমি বারণ করলাম। লোক পাঠাবার বন্দোবস্ত করার কথা জানালাম। বারণ করল, বলল, নিজের লড়াই নিজে লড়বে, ইন ফেয়ার ওয়ে।"

লক্ষ করলাম, চন্দ্রপ্রকাশের মুখে ম্লান হাসি।

এর পর ওঁর প্রশ্ন ভেসে এল, "আজকালকার যুগে ফেয়ার ওয়ে বলে কিছু আছে নাকি?"

আকিদা চেয়ে আছে ওঁর দিকে। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। বোধ হয় সত্যি-মিথ্যে যাচাই করার চেষ্টা করছে।

আবার ভেসে এল ওঁর কথা, "ও বিশ্বাস করত, আছে। নিজের কর্মকর্তাদের জানাল। বুঝল, তারা সব পুরুষ নয়। গভর্নমেন্টের লোকেদের জানাল চিঠি লিখে। বিশ্বাস করত, ফল হবে। বলত, 'কোনও অন্যায় তো করিনি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি।' সেই বিশ্বাস...।" চন্দ্রপ্রকাশ চুপ করলেন। উনি যেন হাঁফাচ্ছেন।

বেশ বুঝতে পারছি যে, অবধেশকুমারকে খুন করার পিছনে চরণপ্রতাপের হাত আছে। কিন্তু তার সঙ্গে অজয়কিশোর শর্মার কী সম্পর্ক?

একটা আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে দেখি, তিন নম্বর ভিকটিম উঠে দাঁড়িয়েছে। আকিদা যেন দেখেও দেখল না।

"মুন্না চলে যাওয়ার পর যখন খবর পেলাম তখন স্থির থাকতে পারিনি।" চন্দ্রপ্রকাশ বলে চললেন, "যখন খবর পেলাম পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে ওরা সক্ষম হয়েছে, বুঝলাম, মুন্নার খুনিকে যতদিন না আমি শাস্তি দিচ্ছি, আমার শান্তি নেই। লোক পাঠালাম ধরে আনতে। বেনারস পালাল। ওখান থেকে দিল্লি।

"কিন্তু আমি ওর পিছু ছাড়িনি। ওর কন্ট্যাক্টস ছিল। আমাকে ছুঁতে পর্যন্ত পারেনি তারা। আই র‍্যান আফটার দ্যাট স্কাউন্ড্রেল টিল হি ওয়াজ আউট অফ ব্রেথ। ইন দ্য মিনটাইম ওর দলের অনেক লোককে আমার দলে টেনে নিয়েছি। ইচ্ছে ছিল কিডন্যাপ করে আমার নিজের জায়গায় এনে ওকে মারি, যেভাবে মুন্নাকে মেরেছিল ও। করলাম তাই, তবে নিজের জায়গায় নয়, এখানে।"

চন্দ্রপ্রকাশ ক্রাচ দিয়ে মেঝেটা ঠুকলেন। এবার আকিদার প্রশ্নটা এল, "বিদ্যাধর মেহতা কি...?"

"এখন আমার লোক, আগে ওর লোক ছিল। এসব লোকেদের পয়সা দিলে এরা দল চেঞ্জ করতে দু' সেকেন্ডও নেয় না। ওকেই বলেছিলাম ওর প্রাক্তন দলনেতাকে নাম চেঞ্জ করে অজয়কিশোর শর্মা নাম নিতে। তারপর বলরামকে ও-ই ডাকে। বলরাম নিজেই সুযোগ নিয়ে ওকে আস্তে-আস্তে হাত করে। আমাদের সম্বন্ধে কিস্সু জানত না, তবে ভয় ধরে গিয়েছিল জানি। সে ভয় কাটানোর জন্য বলরাম ওকে নেশা করতে শেখায়। যে জীবনে কোনও রকমের নেশা করেনি, সে মুন্নার জন্য অম্লানবদনে নানারকম নেশা করতে হেজিটেট করেনি। যখন সময় ঘনিয়ে আসে, বিদ্যাধরকে সিঙ্গাপুরে পাঠাই। তারপর সময় বুঝে আসি, যেভাবে আমার মুন্নাকে মেরেছিল, সেভাবে শেষ করি তাকে। মারার আগে ম্যাগাজিনগুলো খুলে ওকে দেখাই, যাতে বুঝতে পারে ওর শাস্তি হচ্ছে। ধস্তাধস্তিতে বলরামের হাতে ওর সিগারেটের ছ্যাঁকা লাগে। আমার বোতামটা কেড়ে নেয়। ধোঁয়া

আর আধপোড়া সিগারেট বের করে দিলাম জানলা খুলে। ম্যাগাজিনগুলো টেবিলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আসি। বলরামের অবস্থা ছিল না থানায় ফোন করার।”

তিন নম্বর ভিকটিম কখন যে ওর মনিবের পায়ের কাছে এসে বসে পড়েছে খেয়াল করিনি। চন্দ্রপ্রকাশ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “বলরামের নামে ও-ই ফোন করল থানায়। বলরামের বিশ্রাম দরকার ছিল। জানতাম, পুলিশ ওকে ধরবে। ওকে যদি আটকাত, ছাড়াতাম আমিই। পালালে সন্দেহ ওর উপর পড়ত। সব প্ল্যান করা ছিল, এক্সসেপ্ট ইয়োর আনএক্সপেক্টেড অ্যারাইভাল, মিঃ নিউম্যান।”

আকিদা চুপ করে রইল। একটা নতুন নামকরণ হয়েছে বটে তার। দেখি, চন্দ্রপ্রকাশ স্থিরভাবে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। পায়ের কাছে বসা লোকটি হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে। আকিদার গলা পেলাম, “বিদ্যাধর মেহতা যখন কাল এসে...।”

“আসবে না।” চন্দ্রপ্রকাশের তর্জনীটা উঠেছে, “ওর অসুখ হয়েছে আজ থেকে, সিঙ্গাপুরে। অসুস্থ রুগিকে কোনও এয়ারলাইন্স নিয়ে আসবে না জানো বোধ হয়। আর ওর অসুখ সারবে আমি বলার পর। হি ইজ সিম্পলি এনজয়িং অ্যান এক্সটেনডেড হলিডে।”

চন্দ্রপ্রকাশ যেভাবে খোলসা করে বললেন, তাতে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। কিন্তু আমাদের এত কথা বললেন কেন তিনি? তা ছাড়া যেসব প্রমাণ আমাদের কাছে আছে ওঁর বিরুদ্ধে, তাতে তো ওঁকে অ্যারেস্ট করা যেতেই পারে। আর ওঁর বয়ান তো...।

“ম্যাগাজিনে কিন্তু বলা আছে, অবধেশকুমার এসেছিলেন প্রতাপগড় থেকে।” আকিদার গলায় অবিশ্বাসের সুরটা স্পষ্ট।

“আরে।” চন্দ্রপ্রকাশ এবার বিরক্ত হয়ে উঠলেন, “যেসব লোকের কাছে এরকম খুন একটা খবর ছাড়া আর কিস্সু নয়, তাদের কাছে প্রকাশগড় আর প্রতাপগড়, কিছু তফাত আছে?”

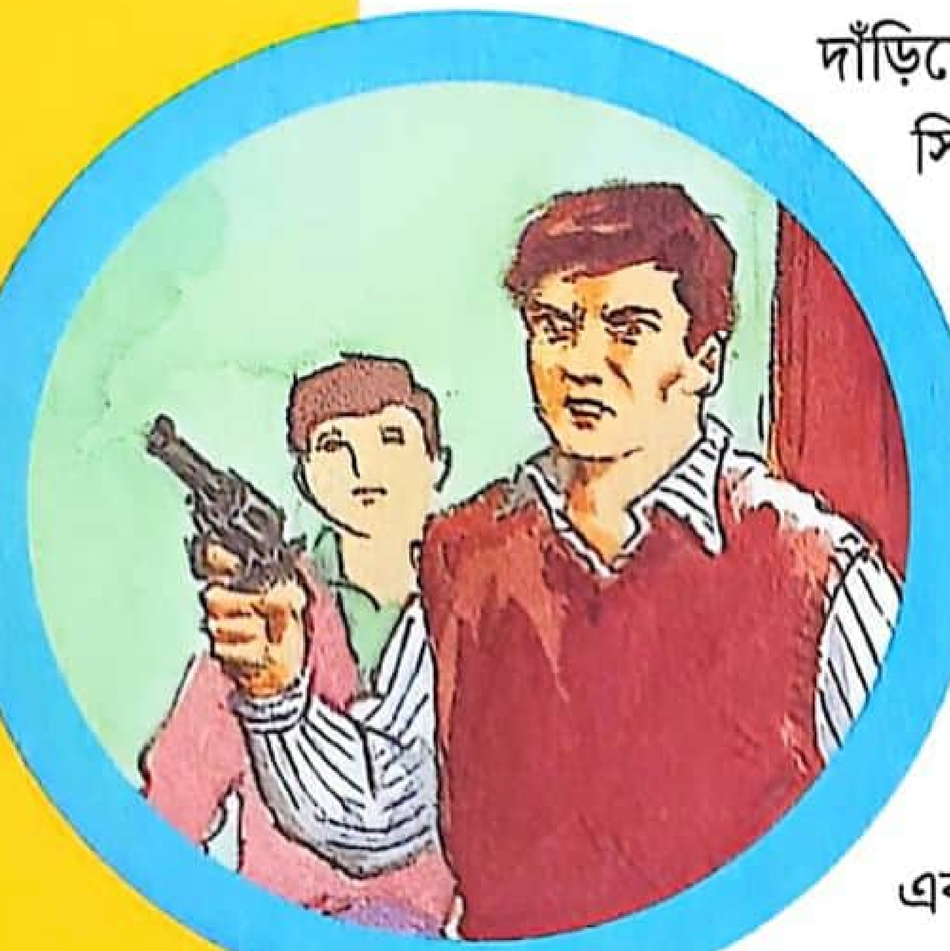
“এত সব আপনি আমাদের বলছেন কেন?” আকিদার প্রশ্নে আমি চমকে গেলাম। বেশ বুঝতে পারলাম আমাদের থট প্রসেস একই লাইনে চলছে। ভাল লাগল, কিন্তু আকিদা যখন ওঁর বিরুদ্ধে আমাদের কাছে প্রমাণের কথা বলল, আমার মোটেই ভাল লাগল না। এটা না বললেই কি নয়?

একটা দীর্ঘশ্বাসের পর আবার চন্দ্রপ্রকাশের গলা পেলাম। চোখ বন্ধ, আওয়াজ মনে হচ্ছে আসছে অনেক দূর থেকে, “আমি পেশাদার খুনি নই। খুন করেছিও এক তাগিদে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি এ জ্বালা সইবার শক্তি আমার নেই। এ লাঘব করার একমাত্র উপায় কাউকে এ বিষয়ে বলা। আই হোপ, তুমি বুঝতে পারছ, সকলের সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা যায় না। তুমি যখন নিজের এলেমে আমার কাছে এসেছ, তখন আমার মনে হল তুমি বুঝলেও বুঝবে।”

একটু চুপ করে থেকে বললেন তিনি, “আই গিভ আ ড্যাম টু ইয়োর ইনক্রিমিনেটিং এভিডেন্স।” চমকে খেয়াল করলাম, ওঁর চোখ খোলা, গলায় একটা মারাত্মক ধারাল ভাব। “তোমার প্রমাণ, তুমি তোমার কাছে রাখবে, না পুলিশে দেবে, সেটা তুমি বুঝবে। আই ডোন্ট কেয়ার।”

“আমি এ জিনিসটা রেখেছিলাম প্রোটেকশনের জন্য। এটার সাহায্য নিয়ে বলছি এম্পটি ইয়োর পকেটস, অ্যান্ড গেট আউট!”

চন্দ্রপ্রকাশের হাতে এক রিভলভার। তিন নম্বর ভিকটিম উঠে



দাঁড়িয়েছে তার মনিবের ইশারার অপেক্ষায়। এসব সিচুয়েশনে হিরোগিরি করতে যাওয়া বোকামি, সুতরাং পাঁচ মিনিটের মধ্যে রিভলভার কার্তুজ আর তালার চাবি দিয়ে আমরা একেবারে শান্তি আবাসের বাইরে। আমাদের ওয়ালেট আর রুমাল রক্ষা পেয়েছে এবং টাকাকড়ি অক্ষত বলাই বাহুল্য।

চারটে বাজে। ভোর হব-হব। রাস্তায় একটু-একটু করে লোক বাড়ছে। একটা দুধওয়ালা সাইকেলে করে দু'দিকে দুধের ক্যান ঝুলিয়ে টিংটিং করতে-করতে চলে গেল। এবার আকিদার গলা পেলাম, "ভৈঁরো রাগে যে একটা বিষণ্ণতার সুর থাকে সেটা যেন আজ ভোরে আরও বেশি করে ফিল করছি। রাতের অন্ধকার কেটেছে, কিন্তু অবচেতন মনের অন্ধকার কাটেনি।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকিদা অপেক্ষামাণ পুলিশ ভ্যানটার কাছে এগিয়ে গেল। ড্রাইভারটা ঢুলছিল, আকিদাকে হঠাৎ দরজা খুলতে দেখে একটা মিনি স্যালুট দিয়ে সোজা হয়ে বসল। আকিদা তারই মোবাইল থেকে সৌগতবাবুকে ফোন করে ঘুম থেকে তুলে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট তৈরি করে চলে আসতে বলল।

"একটু দেরি হবে স্যার।" সৌগতবাবুর গলায় কিন্তু-কিন্তু ভাব, "মানে ফরমালিটি আছে কিনা, তারপর ইয়ে কী বলে, বাড়িতে তো এসব রাখি না, একবার থানায় যেতেই হবে! আটটা তো বাজবেই। আমি বলি কী, আমাদের লোক তো আছেই, আপনি যা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলেন, সে রাত্তিরে পালন না করে সকালে করবে, অ্যাঁ? আপনারাও একটু রেস্ট নিয়ে নিন। আমি ফোন করলেই পৌঁছে যাবেন।"

আমরা বৃথা বাক্য ব্যয় না করে একটা ট্যাক্সি ধরে ঘরমুখো হলাম। আসার আগে আকিদা চন্দ্রপ্রকাশ আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের ডেসক্রিপশন দিয়ে ড্রাইভারকে বলল যে, এদের মধ্যে কাউকে বেরোতে দেখলেই সে যেন তৎক্ষণাৎ আকিদাকে ফোন করে এবং তাদের ফলো করতে শুরু করে। বাড়ি ফিরে আসার এক ঘণ্টা পরেই ফোনটা এল, ড্রাইভারের। সে নাকি কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। মানে তাকে অজ্ঞান করা হয়েছিল। একটি লোক নাকি তার কাছে এসে পানমশলা চায়। ড্রাইভার তাকে দেয় এবং নিজেও নেয়। আর কিছু মনে নেই তার। সে ফাউল প্লে সন্দেহ করছে। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "স্যার মানে বড়সাহেবকে আমি কি রিপোর্ট করব?"

আকিদা খুব ঠান্ডা মাথায় তাকে পানমশলাওয়ালার ডেক্রিপশন দিতে বলল। এবং শুনে তার মনে হল, বলরাম।

"নির্ঘাত অজয়কিশোর শর্মার দাওয়াইতে লেফটওভার মিশিয়েছে।" মন্তব্য করল আকিদা। "ভাগ্যিস ওভারডোজ হয়নি, তা হলে আর দেখতে হত না।" তারপর ড্রাইভারকে বাড়ি যেতে বলল। বড়সাহেব মানে সৌগতবাবুকে ঠিকঠাক রিপোর্ট করতে বলে আকিদা ধপাস করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ে বলল, "ব্যাটারা পালিয়েছে শান্তি আবাস থেকে। ব্যাড মিসটেক।"

"সৌগতবাবু কিন্তু তখন চলে এলে এ জিনিসটা হত না।" আমি বাধ্য হলাম বলতে।

"ওঁর উপর অন্য ধরনের চাপ এলে আমি আশ্চর্য হব না," ক্লান্ত স্বরে বলল আকিদা। ভাগীরথী এসে চা দিয়ে গেল।

"এ কেস তবে শেষ?" আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আকিদা সৌগতবাবুকে ফোন করে ড্রাইভারের ঘটনাটা জানাল। প্রকাশগড়ের পুলিশকে খবর দিয়ে চন্দ্রপ্রকাশকে অ্যারেস্ট করতে বলল। "আপনার জানা উচিত যে, আপনি অজয়কিশোর শর্মার মার্ডার ইনভেস্টিগেট করছেন না, করছেন আরাহ জেলার পিনচাওয়া গ্রামের মাফিয়া চরণপ্রতাপ পান্ডের।"

"বলেন কী?" সৌগতবাবুর গলায় নতুন সুর।

"এঁদের সম্বন্ধে যে ইনফরমেশন চেয়েছিলাম, তার দরকার নেই। বলরামের হাতের ছাপ নিয়ে খোঁজারও দরকার নেই।"

"একদিক দিয়ে ভালই হল।" সৌগতবাবুর গলায় চেনা সুর।

"কিন্তু খুনির শাস্তি হওয়া উচিত।" ও ছাড়ার পাত্র নয়।

"তা তো বটেই, তা তো বটেই। ডোন্ট ওয়রি! স্যার, আমি আপনাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাক্কা খবর এনে দিচ্ছি।"

খবর এল ঠিকই, কিন্তু চব্বিশ নয় ছত্রিশ ঘণ্টার পর। প্রকাশগড়ের পুলিশ চন্দ্রপ্রকাশ পান্ডেকে ধরতে পারেনি। "এখন তাকে কোনও পুলিশই ধরতে পারবে না।" বললেন সৌগতবাবু।

"মানে?" আকিদার গলায় একটা তীক্ষ্ণ সুর। সে যে রীতিমতো অবাক এবং হতাশ, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

"হি ইজ ডেড স্যার।" সৌগতবাবুর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম ফোনে, "হার্ট অ্যাটাক। শুনলাম, কলকাতা ফেরত রাস্তাতেই এই ঘটনা ঘটেছে। একটাই অ্যাটাক, ম্যাসিভ। পাঁচ মিনিটে শেষ।"

আকিদা চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছিল, এবার ধপ করে বসে পড়ল। "বলরামকে ধরার চেষ্টা করলাম।"

সৌগতবাবুর গলা শুনতে পেলাম ফোনে। "শুধু হাতের ছাপের এভিডেন্সে হল না। তা ছাড়া, যখন লিখিত বয়ানে চন্দ্রপ্রকাশ নিজেই সব দোষ স্বীকার করেছেন, সেখানে বলরামকে অ্যারেস্ট করি কী করে?"

"তবে!" একটা গ্যাপ দিয়ে বলে চললেন সৌগতবাবু, "প্রকাশগড়ের পুলিশ পারত না চন্দ্রপ্রকাশকে অ্যারেস্ট করতে।"

"কেন?"

"আরে, শুনেছি সে নাকি ওখানকার এক আনক্রাউনড কিং ছিল। ওই যে বলে না, ওর নামে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়, ওরকম। পিতৃদত্ত নাম চন্দ্রপ্রকাশ, কিন্তু ওখানকার জনতার কাছে ও ছিল চন্দ্র-সূর্যের মতো। জনতা ওকে 'সূর্যকিরণ', 'সুরিয়া সরকার' এসব নামেই ডাকত।"

ফোনটা অফ করে দিয়ে নিজের চেয়ারে আধশোয়া হয়ে রইল আকিদা। চোখ বোজা, হাত দু'টো বুকের কাছে জড়ো করা। চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়াল নেই সেদিকে। মিনিট দশেক পর চোখ খুলে আকিদা খুব হতাশভাবে বলল, "আলটিমেট রহস্য রয়েই গেল।"

"মানে?"

আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল আকিদা, "কবে এসব খুনোখুনি বন্ধ হবে বলতে পারিস?"

আমি চুপ করে রইলাম। এ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। কারওর কাছে আছে কি?

(সমাপ্ত)

বিষবৈদ্য

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য



কথা হচ্ছিল মাকড়সা নিয়ে। কাগজে বেরিয়েছে, বর্ধমানে নাকি ট্যারান্টুলা মাকড়সা দেখা গিয়েছে। তারা লাফিয়ে উঠে পায়ে কামড়ে দেয়! ভয়ানক বিষ। নিতু মুখ মটকে বলল, "ওসব কাগজওয়ালাদের বানানো গল্প। ট্যারান্টুলা বর্ধমানে এলে বাঁচবে নাকি?"

নিতু জুলজিতে অনার্স নিয়ে বি এসসি পাশ করেছে গত বছর। এম এসসি পড়ছে। অতএব তর্কটা ওখানেই থেমে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু থামল না ওর কাকার জন্য। ভদ্রলোক সারাজীবন নানা ঘাটের জল খেয়ে বেড়িয়েছেন। কীসব কবিরাজি ওষুধের ব্যাবসাট্যাবসা করেন, আর প্রতিদিন বিকেলে আমাদের ক্লাবে এসে বসে থাকেন। আজও ছিলেন। এক কোণে বসে মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আমাদের কথাবার্তা যে শুনছেন তা বোঝা যায়নি। হঠাৎ বললেন, "নিতু, তোদের সিলেবাসে কি অ্যারাকনোলজি, মানে মাকড়সাতত্ত্ব আছে?"

নিতু একটু আমতা-আমতা করে বলল, "ওই একটুআধটু...।"

"ট্যারান্টুলা নিয়ে এমন খবর তুই কোন বইয়ে পড়েছিস বল তো?"

"না, মানে...।"

"মাকড়সাদের যে কী সাংঘাতিক অ্যাডাপ্টিবিলিটি, তা তুই জানিস?"

"কিন্তু কাকা, তাই বলে বর্ধমানে ট্যারান্টুলা...!"

"বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই তো? তোরা

কেউ ল্যাট্রোডেকটাস বিশপি-র নাম শুনেছিস?”

নিতুর মুখ দেখে বোঝা গেল, অবস্থা সুবিধের নয়। শমিত একটা ক্ষীণ চেষ্টা করেছিল, “কোনও ইউরোপিয়ান বিশপ মানে ধর্মযাজকের...?”

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়েই কাকা অট্টহাস্য করে উঠলেন, “ধর্মযাজকই বটে। এর ডাকনাম রেড উইডো। লাল টুকটুকে মাথা আর পা, কুচকুচে কালো পেটের গায়ে কমলা আর সাদা দাগ। বিদ্যুতের মতো দ্রুতগতি, সাক্ষাৎ যমদুত এই মাকড়সার আদি বাসা ফ্লোরিডার দক্ষিণ আর মধ্য অঞ্চলের আধা মরুভূমির বেঁটে পাইন আর পাম ঝোপে। আমি জলপাইগুড়ির জঙ্গলে তার দেখা পেয়েছি। রেড উইডোর প্রাণঘাতী বিষ ঠিক কীভাবে কাজ করে তা কোথাও সঠিক লেখেনি। কিন্তু পাঁচদিন ধরে এ বিষের ক্রিয়া দেখেছি, আর প্রাণের দায়ে তার ওষুধও খুঁজে বের করতে হয়েছে। তবে সবই ত্রিলোক আথুরিমশাইয়ের দয়ায়।”

আমরা ততক্ষণে চা, তাস, অস্কার, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সব ছেড়ে এসে নিতুর কাকাকে ঘিরে বসেছি।

॥ ২ ॥

“বটানি নিয়ে এম এসসি পাশ করে দু' বছর ফ্যাফ্যা করে এদিকওদিক ঘুরে শেষে বউদির মুখ মটকানি যখন সহ্যের সীমা ছাড়াব-ছাড়াব করছে, তখন অনাদিকবিরাজের সঙ্গে আলাপ। কবিরাজমশাই উত্তরবঙ্গ আর অসম-এ ঘুরে-ঘুরে কাজ করবার জন্যে লোক চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। গাছগাছড়ার জ্ঞান থাকা দরকার, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের মধ্যে হতে হবে। আর প্রত্যেক মাসে বাড়ির বাইরে টুরে যেতে হবে। সেল্‌সম্যানেরই কাজ হবে নিশ্চয়ই। সবক'টা কোয়ালিফিকেশন আমার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছিল। বয়স, শিক্ষা, আর সবচেয়ে বড় কথা বাড়ি থেকে অনেক দিন ধরে দূরে থাকবার সুযোগ! তার জন্য হাতুড়ে কবিরাজের ওষুধের ফিরিওয়ালা হতেও আপত্তি নেই। চুলোয় যাক আমার সায়েন্সের পড়াশোনা। যে বিদ্যেয় ভাত জোটে না, তার সিকি পয়সা দাম নেই তখন আমার কাছে।

“কবিরাজমশাইয়ের কাছে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে দু'টো ভুল ভাঙল। এক, কাজটা সেল্‌সম্যানের নয়। উত্তরবঙ্গ আর উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গল অঞ্চলে ঘুরে-ঘুরে দুর্লভ জাতের ওষধি-লতা, শেকড়বাকড় জোগাড় করে আনতে হবে বিভিন্ন ঋতুতে। আর দুই, কবিরাজমশাই মোটেই হাতুড়ে নন। গাছগাছড়ার উপরে ওঁর কাছে দিশি-বিলিতি বইয়ের ঈর্ষণীয় সংগ্রহ। বইগুলো যে শুধু সাজিয়ে রাখা থাকে না, সেটা ওঁর সঙ্গে মিনিট দুয়েক কথা বললেই পরিষ্কার বোঝা যায়। আয়ুর্বেদ বিদ্যেটাকে জেনে-বুঝে ব্যবহার করতে জানেন। বিরাট পশার। পেটেন্ট ওষুধ আছে অন্তত দশ রকমের। নিজেরই কারখানায় লোক দিয়ে বানান। তার বিক্রি প্রচুর। রেডিওতে বিজ্ঞাপনটনও হয়।

“চাকরিটা হয়ে গেল। আমার বটানির জ্ঞান পরখ করে অনাদিকবিরাজ খুশি। ঠিক হল, মাসে পাঁচশো টাকা মাইনে পাব, সেই সঙ্গে টুরের টিএ, ডিএ। এক-এক মাসে পনেরো দিন টুরে থাকতে হবে, আর ফিরে এসে বাকি পনেরো দিন কালেকশন বুঝিয়ে দেওয়া এবং তার প্রসেসিং-এর জন্যে কারখানায় সাহায্য করা। কোন টুরে কোথায় যাব, কার সঙ্গে দেখা করতে হবে, সেসব ঠিক করে দেবেন অনাদিকবিরাজ। ট্রাভেল কিটের জিনিসপত্তরের একটা লম্বা লিস্ট আর সেসব কেনবার জন্য অ্যাডভান্সের শ' চারেক টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম সেদিন। মাকে বলতে মা খুশি হলেন। আজ থেকে বেশ কিছুকাল আগের কথা বলছি। পাঁচশো টাকা তখন মোটেও কম টাকা নয়। বউদিও খুব খুশি। অনেক মিষ্টি কথা বলল।

“হার্ব কালেক্টরের কাজটা মোটেও সহজ নয়। বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হয়। স্থানীয় আদিবাসীদের থেকে শুরু করে জন্তু-জানোয়ার, রোদ, জল, সকলের মেজাজ বুঝে সমঝে চলতে হয়। একটু বেচাল হলেই মুশকিল। কাজ তো হবেই না, প্রাণ নিয়েও টানাটানি পড়তে পারে। তবে হ্যাঁ, অনেক দেশও দেখা হয়। শিলিগুড়ি থেকে রওনা দিতাম, তারপর, জলপাইগুড়ি থেকে শুরু করে কখনও অসম হয়ে লুহিত নদীর পার ধরে অরুণাচলের ইয়েপাক পর্যন্ত চলে গিয়েছি লতাপাতার খোঁজে। কখনও আবার আলিপুরদুয়ার হয়ে টোটোপাড়া ছাড়িয়ে জয়ন্তী পাহাড়ের জঙ্গলে দিনের পর দিন কেটেছে। এই অঞ্চলেই ত্রিলোক আথুরির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। 'বিষশাস্ত্রে' আমার হাতেখড়ি ওঁর কাছেই। আজ আমি যা হয়েছি, বিষবিজ্ঞানে দেশে-বিদেশে যেটুকু নামডাক হয়েছে, সবই আথুরিমশাইয়ের দয়ায়। ওঁর আত্মা শান্তিতে থাক! অমন গুরু আর দ্বিতীয়টি দেখলাম না! যদিও, অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে গিয়ে প্রথমেই প্রাণটা যেতে বসেছিল। তবে সে আমার ঔদ্ধত্যের শাস্তি। ওর দরকার ছিল। যাকগে, আথুরিমশাইয়ের গল্পটা বলি।

“অনাদিকবিরাজের কাছে আমার চাকরি তখন প্রায় পাঁচ বছর পেরিয়েছে। সেটা ছিল ডিসেম্বর মাস। জয়ন্তী নদীর শুকনো খাত ধরে চলেছি আইবুক বলে একটা জায়গার খোঁজে। ম্যাপে ওর নাম নেই। জয়ন্তী মন্দিরে যাওয়ার চড়াই বেয়ে ঘণ্টা কয়েক চলার পর রুটটাকে হাতের ডাইনে ছেড়ে সরু একটা ট্রেল ধরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ। শীতের দুপুর। ট্রেলে পা দিয়েই চোখে পড়ল, তাজা ধোঁয়া ওঠা এলিফ্যান্ট ড্রপিং। সাবধান হয়ে গেলাম। হাওয়া বইছিল আমাদের সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে। ফলে হাতি আমাদের গন্ধ পাবে না। কিন্তু হাঁটাচলার শব্দ ঠিক শুনতে পাবে, অনেক দূর থেকেও। তাই একটাও কথা না বলে, হাঁচি-কাশি চেপে আমাদের চারজনের দলটা পা-টিপেটিপে, চারদিকে চোখ চালিয়ে এগোচ্ছি, এমন সময় আমার ডান দিকে একটা বিকট চিৎকার উঠল। তাকিয়ে দেখি আমাদের গাইড জটেশ্বর দিউ মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। দু' হাতে চেপে ধরা ডান পা'টা আমাদের চোখের সামনে আস্তে-আস্তে লাল হয়ে ফুলে উঠছে। হাতির কথা তখন আর কারও মনে নেই। আমাদের সঙ্গে ব্যাগট্যাগ বইবার জন্য দু'টো স্থানীয় ছেলে ছিল। জটেশ্বরের পায়ের দিকে একবার তাকিয়েই ওরা কিটব্যাগ খুলে এক বোতল কার্বলিক অ্যাসিড বের করে হড়হড় করে চারপাশে ঢেলে দিল। জটেশ্বর ততক্ষণে অজ্ঞান। গা ঠান্ডা, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গ্যাঁজা বের হচ্ছে। এই শীতে সাপ বের হবে না। কিসে কামড়াল



তবে ছেলেটিকে? নাকি, মৃগী আছে?

"পা'টা ভাল করে দেখলাম। গোড়ালির ঠিক কাছটায় দু'টো ছোট-ছোট রক্তমুখী ফুটো। কবিরাজমশাইয়ের সঙ্গে কাজ করে রোগ-ব্যাধির ব্যাপারে তখন কিছুটা ধারণা হয়েছে। কিসে কামড়েছে সেটা তক্ষুনি একেবারে সঠিক না বুঝলেও এটুকু বুঝলাম যে, তীব্র একটা টক্সিক এফেক্ট পা থেকে শুরু হয়ে ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়েছে ওর শরীরে। রিফ্লেক্স চলে গিয়েছে। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মেরেকেটে আর একঘণ্টা আয়ু ওর। থেকে-থেকে মৃদু একটা শরীরজোড়া ঝাঁকুনি আসন্ন মৃত্যুর ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছিল।

"সঙ্গের ছেলে দু'টো হঠাৎ বলল, 'স্যার, কাছেই বিষবৈদ্য ত্রিলোক আথুরিমশাইয়ের ঘাঁটি। জটাদাকে ওখানে একবার নিয়ে গেলে হয় না?'

"আমি বারণ করতে যাচ্ছিলাম, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র যতটুকু জেনেছি তাতে ও শাস্ত্রে এ ধরনের বিষক্রিয়ার কোনও প্রতিষেধক নেই। অতএব জঙ্গলে তান্ত্রিকের ছু'মন্তর যে কতটা কাজ করবে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তবু শেষ মুহূর্তে বেচারা কিছু একটা চিকিৎসা পেয়েছিল, এই সান্ত্বনাটা তো থাকবে! রাজি হয়ে গেলাম। জটেশ্বরের অজ্ঞান শরীরটা নিয়ে চড়াই-উতরাই ধরে বন ভেঙে চলল ছেলে দু'টো, আমি ওদের পিছন-পিছন।

"প্রায় মাইল চার জঙ্গল পেরিয়ে একটা ছোট্ট ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। জঙ্গলের মধ্যে কাঠাচারেক জায়গা বাঁশের ছিলকের বেড়া দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে একটা টালির চালের বাড়ি। এই জটেশ্বরকে নিয়ে আমরা তিনজন গিয়ে ঢুকলাম বাড়ির উঠোনে। হাঁকডাক শুনে ঘর থেকে যিনি বের হলেন, তাঁকে দেখে মোটেই ভরসা জাগে না। মেরেকেটে সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা। বয়স আশির উপর। গায়ের রং জ্বলে-পুড়ে গভীর খয়েরি। হলদে একটা ধুতি পরা। খালি গায়ে পাঁজরাগুলো গোনা যায়। কিছু একটা গুঁড়ো করছিলেন হয়তো। চ্যাঁচামেচি শুনে হাতে হামানদিস্তার ডাঁটিটা নিয়েই বের হয়েছেন। এলোমেলো সাদা চুল-দাড়ির ফাঁকে একঝলক আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে মাটিতে শোয়ানো জটেশ্বরের দিকে ফিরলেন। প্রায় দশ মিনিট ধরে চলল পরীক্ষানিরীক্ষা। চোখ, জিভ, হাত-পায়ের চেটো, পায়ের ক্ষতস্থান, কিছুই বাদ গেল না।

"বুজরুক আমি কম দেখিনি। বিশেষ করে আমাদের কবিরাজি লাইনে। অনেকে তো কবিরাজির সঙ্গে জ্যোতিষ, অ্যালোপ্যাথি সমস্ত মিশিয়ে যার মাথায় যেমন হাত বুলনো যায় বুলিয়ে নেন। এঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, বেশ পাকা লোক। বুজরুকিটাকে দর্শকের চোখে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে জানেন।

"দেখেটেখে শেষে আথুরিমশাই যখন মাথা তুললেন, ততক্ষণে জটেশ্বরের নড়াচড়া একেবারেই বন্ধ। নিশ্বাসের মৃদু ঘড়ঘড় শব্দটাও আর শোনা যাচ্ছে না।

"ভদ্রলোকের হাবভাব দেখে আমার মুখে বোধ হয় এক চিলতে হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল। দেখলাম, আথুরিমশাইয়ের তা নজর এড়ায়নি। সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী মনে হয়, বাঁচবে?'

"মাথা নাড়লাম, 'না।'

" 'কত দিন আছ এ লাইনে?'

" 'পাঁচ বছর।'

"একটা বিদ্রূপের হাসি ছড়িয়ে গেল বুড়োর মুখে, 'পাঁচ বছরের বিদ্যেয় জীবন-মরণের নিদান হাঁকছ ছোকরা? এ কিসের কামড় তুমি জানো?'

"বললাম, 'সঠিক বলতে পারি না, তবে সম্ভবত এক ধরনের মাকড়সার কামড়। ক্ষতটা দাঁড়ার, দাঁতের নয়। আর, এমন কোনও বিছে নেই যা এতটা বিষাক্ত হতে পারে। কাজেই ওটা যে বিষাক্ত কোনও মাকড়সার কামড় সেটা অনুমান করে নেওয়া যায়। আর এও বলতে পারি, এ বিষের কাটান কবিরাজি শাস্ত্রে নেই।'

"শুনতে-শুনতে আথুরিমশাইয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বললেন, 'বেশ বেশ! তোমার মতো চোঙা প্যান্টালুন পরা ছোকরার কাছে বিষশাস্ত্রের ব্যাপারে এতটা জ্ঞান আশা করিনি। কিন্তু আয়ুর্বেদশাস্ত্রটা এত ছোট নয় যে, পাঁচ বছরে তুমি হজম করে ফেলবে। আমি গত পঞ্চাশ বছরেও...।'

"আপন মনে কথা বলতে-বলতে পিছন ঘুরে ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন আথুরিমশাই। বের হয়ে এলেন একটা আতশ কাচ, একটা কাচের শিশি, ছুঁচ আর একটা মোটা পুঁথি নিয়ে। পুঁথিটা মাটিতে রেখে শিশির মধ্যে ছুঁচ ডুবিয়ে নিয়ে অভ্যস্ত হাতে বারবার গেঁথে দিতে লাগলেন জটেশ্বরের কানের দু'পাশে, গলার পাশে ক্যারটিড ধমনির উপরে, মেরুদণ্ডের দু'পাশে ছ'টা নির্দিষ্ট বিন্দুতে। প্রতিটা খোঁচার সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুতের শক পাওয়ার মতো কেঁপে উঠছিল জটেশ্বরের শরীর। ছুঁচ ফোটানোর কয়েক মিনিট পর আবার জটেশ্বরের গলায় মৃদু ঘড়ঘড় শব্দ পাওয়া যেতে লাগল। বারবার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছে শরীরটা। তার মণিবন্ধে আঙুল দিয়ে আথুরিমশাই তখন ধ্যানস্থ। মিনিট দুই পরে নাড়ি ছেড়ে দিয়ে পুঁথিটা খুলে বসলেন তিনি। তাঁর নির্দেশে জটেশ্বরের আহত পা'টাকে চেপে ধরে রয়েছে ছেলে দু'টো, আর আতশ কাচে চোখ রেখে ক্ষতটাকে পরীক্ষা করতে-করতেই দ্রুত হাতে পাশে রাখা পুঁথির পাতা উলটে যাচ্ছেন আথুরিমশাই। উঁকি মেরে দেখলাম, পাতায়-পাতায় নানা ধরনের ক্ষতচিহ্নের ফোটো আর তার পাশে-পাশে এক-একটা পোকা, বিছে বা মাকড়সার স্কেচ। ছবির নীচে দেবনাগরী হরফে বিস্তারিত বিবরণ লেখা। বেশ খানিকটা খোঁজাখুঁজির পর একটা পাতায় এসে বৃদ্ধের আঙুল থেমে গেল। ফোটোর সঙ্গে খানিকক্ষণ ক্ষতটাকে মিলিয়ে নিয়ে ছেলে দু'টোকে দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিতে তারা জটেশ্বরকে ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। মিনিট পনেরো পরে ফিরে এল একগোছা লতাপাতা নিয়ে। সেগুলো নিয়ে আথুরিমশাই ঘরে ঢুকে পড়লেন। কয়েক মিনিট পরে বের হয়ে এলেন একটা ছোট হামানদিস্তা হাতে। তার ভিতর থেকে একটা কালচে সবুজ মলম আঙুল দিয়ে তুলে-তুলে জটেশ্বরের জিভে, নাক-কানের ফুটোয়, পায়ের ক্ষতের উপরে লাগিয়ে দিলেন। অবশিষ্ট মলমটা দু' হাতের চেটোয় নিয়ে ডলে-ডলে মাখিয়ে দিলেন গোটা শরীরে। কোনও মন্ত্র উচ্চারণ করেননি।

"ওষুধটা লাগাবার সঙ্গে-সঙ্গে জটেশ্বরের শরীরের ঝাঁকুনি কমে এসেছিল। মিনিট দশেক পর আর-একবার নাড়িতে হাত ছুঁইয়ে দেখলেন আথুরিমশাই, তারপর ওকে ওইভাবেই শুইয়ে রেখে পিছন ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

"খানিকক্ষণ পর দরদর করে ঘামতে

শুরু করল জটেশ্বর। জামাকাপড়, মাথার চুল, সবকিছু ভিজে চুপচুপ করছে। শরীরের চারপাশের মাটি পর্যন্ত ভিজে উঠেছে। একটা ছেলে ভয় পেয়ে আথুরিমশাইকে ডাকতে গিয়েছিল, সাড়া দেননি। আমি তখন জটেশ্বরকে নিয়ে ব্যস্ত। নাড়ির গতি তখনও ক্ষীণ, কিন্তু নিয়মিত। চোখের পাতা টেনে দেখেছি। বিস্ফারিত তারারন্ধ্র আস্তে-আস্তে ছোট হয়ে আসছে। আমার শেখা আয়ুর্বেদশাস্ত্রের সব বিদ্যেকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে জটেশ্বর। যেসব লতাপাতা থেকে মলমটা তৈরি হয়েছিল তার প্রায় সবই চিনি। সাধারণ সব ভেষজ। জ্বরে, কাশিতে, গায়ের ব্যথায় কাজে লাগে। অথচ তাদের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল মারণ বিষের অমোঘ প্রতিষেধক! আমার মনের মধ্যে একটা লোভ মাথা তুলছিল। এই বিষবৈদ্য যা জানেন তা আর কেউ জানে না। একবার শিখে নিতে পারলে...।

"দুপুর কেটে কখন যে সন্ধে হয়ে এসেছে খেয়াল করিনি। আইবুক চুলোয় যাক। ও কাজে আমি আর নেই। সঙ্গের লোকগুলোকে ফিরিয়ে দিয়ে বসে আছি আথুরিমশাইয়ের দরজার সামনে, সেই দুপুর থেকেই। দরজা খোলেননি। ভিতরে মাঝে-মাঝে হামানদিস্তার আওয়াজ শুনেছি, আর শুনেছি পুঁথির পাতা ওলটানোর শব্দ।

"সন্ধের মুখে দরজা খুলল। বারান্দার একপাশে বসেছিলাম। আথুরিমশাই প্রথমে আমাকে খেয়াল করেননি। সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভুঁরু কুঁচকে বললেন, 'মতলবটা কী? এখনও এখানে যে!'

"বললাম, 'আপনার কাছে শিখব।'

" 'এত দিন কার কাছে শিখেছ?'

" 'অনাদিকবিরাজের কাছে।'

"বৃদ্ধের মুখ কঠিন হল, 'অনাদিও এক দিন তোমারই মতো আমার কাছে এসেছিল। তোমারই মতো বলেছিল, শিখবে। হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছি ওকে। কিন্তু সামান্য ক'দিন কাজ শিখেই আমার একটা পুঁথি চুরি করে পালাল। ওইতেই করে খাচ্ছে শুনতে পাই। সে তোমাকে অসততা ছাড়া আর কী শেখাবে? আমার তো সন্দেহ হচ্ছে ও-ই তোমাকে কৌশল করে এখানে পাঠিয়েছে।'

"আমি বললাম, 'জটেশ্বরের ঘটনাটা তো সাজানো নয়। আর আমি যদি অনাদিকবিরাজের হয়ে চরবৃত্তি করতেই আসতাম তা হলে তাঁর নাম আপনার সামনে করতাম কি?'

"আথুরিমশাইয়ের চোখ দু'টো চিকমিক করে উঠল, 'বেশ, তোমার যুক্তি মেনে নিলাম। শেখাব তোমায়, তবে পরীক্ষা দিতে হবে। যদি অনুপযুক্ত হও, কঠোর শাস্তি পাবে। আর, টিঁকে গেলে, শেখাব। কাল সকালে পরীক্ষা, এখন এই বারান্দায় শুয়ে ঘুমোও। ভয় নেই, আমি রাতে জেগে থাকি।'

॥ ৩ ॥

"ভোর-ভোর ঘুম ভাঙল, খিদে পাচ্ছিল খুব। রাতে খাওয়া জোটেনি। আথুরিমশাইয়ের ঘরের দরজা খোলা। কোথায় যেন বেরিয়েছেন। ফিরলেন খানিক পরে। হাতের পোঁটলাটা নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আগে খেয়ে নাও।'

"পোঁটলায় প্রচুর মুড়ি আর গুড় ছিল। পেট ভরে খেয়ে এক ঘটি জল খেলাম। শরীর জুড়িয়ে গেল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাতে দম পড়েনি। বেলা দেখে মনে হচ্ছিল সাতটা মতো হবে। আথুরিমশাই ততক্ষণে একটা মুখবন্ধ কাঠের বাক্স নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। বাক্সটার উপরে ছোট-ছোট ফুটো। সেটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বারান্দার একধারে একটা ছোট্ট টুলের উপর পা তুলে উবু হয়ে বসে বললেন, 'এবারে বাক্সটা খোলো।'

"বাক্সটা হাতে তুলে ধরে খুলতে যাব, আথুরিমশাই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'ওরকমভাবে মুখের কাছে ধরে খুলো না, মাটিতে রেখে খোলো।'

"বন্ধ ডালার ভিতর থেকে একটা মৃদু খর-খর শব্দ আসছিল। আস্তে-আস্তে মাটিতে নামিয়ে রাখলাম বাক্সটা। একটা অজানা ভয় জমছিল ভিতরে...।

"তীক্ষ্ণদৃষ্টি বৃদ্ধের তা নজর এড়ায়নি। মুচকি হেসে বললেন, 'ভয় পেলে? তবে থাক বরং।'

"এরপর আর পিছনো যায় না। খিলটা টেনে সরিয়ে আস্তে-আস্তে ঢাকনাটা একটু তুলে দেখি ভিতরে পাতা লতার গদির উপর একটা মাকড়সা। খুব বড় নয়। হাতের চেটোর ঠিক মাঝখানে রাখলে আঙুলের গোড়াগুলো পর্যন্ত তার ঠ্যাং পৌঁছবে। কুচকুচে কালো পেট, লাল মাথা আর লাল রঙের পা। মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে একটা ঠান্ডা শিরশিরানি নেমে গেল। তাড়াতাড়ি ঢাকনা বন্ধ করতে গেলাম, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। মাকড়সাটা হঠাৎ একটু নড়ে উঠল। তারপর বন্ধ হয়ে আসা ঢাকনার একচিলতে ফাঁক দিয়ে বাইরে বের হয়ে এসে একটা লাল-কালো বিদ্যুতের মতো ছিটকে এল আমার বাঁ পায়ের পাতার উপর। তীব্র একটা যন্ত্রণার ধমক ছড়িয়ে পড়ল শরীর জুড়ে। জ্ঞান হারাতে-হারাতে দেখেছিলাম, জীবটা কিলবিল করে বারান্দা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তার চেয়েও ক্ষিপ্রবেগে আথুরিমশাই একটা লাফ মেরে গিয়ে পড়েছেন উঠোনের উপর। বাঁ হাতের দু'টো আঙুল দিয়ে জীবটাকে চেপে ধরে এগিয়ে আসছেন বারান্দার দিকে।

॥ ৪ ॥

"চোখ মেলতে তীব্র রোদের ঝলক চোখ ধাঁধিয়ে গেল। জলতেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম, উঠোনে শুয়ে আছি। এক ঘটি জল রাখা রয়েছে মাথার কাছে। গাছের পাতার মোড়কে ভাত-তরকারির একটা প্যাকেট দিয়ে জলের ঘটিটা ঢাকা, তার পাশে ভাঁজ করা একটুকরো কাগজ। আথুরিমশাইয়ের ঘরে তালা লাগানো। জঙ্গলের মধ্যে সেই ছোট্ট বাড়িতে আমি একেবারে একলা শুয়ে আছি।

"খানিকটা জল খেয়ে মাথায়-মুখে জলহাত বুলিয়ে একটু সুস্থ হওয়া গেল। কাগজটা খুলে দেখি একটা ছোট্ট চিঠি। সম্বোধনবিহীন সে চিরকুটটায় লেখা—

" *'তোমায় যে মাকড়সা কামড়েছে, সাহেবি ভাষায় তার নাম উইডো। এর কামড় খাওয়ার পর এক ঘণ্টার বেশি কোনও প্রাণীকে বেঁচে থাকতে দেখিনি। এর একটামাত্র প্রতিষেধক আছে, আমার আবিষ্কৃত। দু' বার প্রয়োগ করতে হয়। প্রথমবার, কামড় খাওয়ার একঘণ্টার মধ্যে। তোমার অজ্ঞান অবস্থায় আমি প্রথম ডোজটা তোমার উপর প্রয়োগ করেছি। এতে মৃত্যু আটকায় বটে, তবে পাঁচদিনের জন্য। কবিরাজ লাইনে যখন*



গল্প

আছ, নাড়িজ্ঞান নিশ্চয়ই আছে। নিজের নাড়ি ধরে দেখো, গতি টের পাবে। বিষক্রিয়ার উপস্থিতির প্রমাণ নাড়ির এই বিশেষ গতি। দ্বিতীয় ডোজটা না পড়লে, দু' দিনের মাথায় তোমার বাকরোধ হবে। পঞ্চম দিনে প্রথমে দৃষ্টিশক্তি হারাবে, আর তারপর সমস্ত শরীরকে পঙ্গু করে দিয়ে আসবে অসম্ভব যন্ত্রণাদায়ী মৃত্যু। প্রতিষেধক খুঁজে পাওয়ার সূত্র নীচে দিলাম। পাঁচ দিন পরে আমি ফিরে আসব। তারপর তোমার সৎকার অথবা শিক্ষার দায়িত্ব আমার।

আশীর্বাদক,
ত্রিলোক আথুরি'

"এর নীচে একটা ছোট ছড়া লেখা...

'পায়ের পরে পা... আ নয়কো এ
একটা মাত্র পায়ের নীচে জন্ম নেছে সে।
আধেক শরীর মাটির উপর আধেক শরীর নীচে,
বাচ্চা দু'টো হাওয়ায় দোলে আগে এবং পিছে।
মায়ের রক্তে মাখিয়ে নিয়ে একটা ছেলের মাস,
বাঁচতে হলে মায়ের পোয়ের রক্ত মাংস খাস।'

"পাঁচ দিন কেটে গিয়েছে তারপর। এ এক বিচিত্র বন। কতবার বের হওয়ার চেষ্টা করলাম, পারিনি। নতুন-নতুন দিকে গিয়েছি বারবার। পাহাড় পেরিয়ে ঝোরার জল পেরিয়ে, কাঁটাগাছের খোঁচা খেয়ে ক্রমাগত দুর্বল হয়ে আসা শরীর নিয়ে বন থেকে লোকালয়ে যাওয়ার পথ খুঁজেছি, কিন্তু বারবারই পথ এসে শেষ হয়েছে আথুরিমশাইয়ের কুঁড়ের সামনে। কাছেই একটা ছোট ঝরনা আছে। তাতে অঢেল জল। আর বাড়ির একপাশে একটা বিরাট পেঁপেগাছে অনেক কাঁচা-পাকা পেঁপে। ওই পেঁপে আর ঝোরার জল খেয়ে এই ক'দিন কেটেছে।

"সেদিন দুপুরবেলা ওই পেঁপেগাছটার তলায় ঝোপঝাড়ের মধ্যে শুয়েছিলাম। আথুরিমশাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে শুরু করেছে। গলায় অসহ্য যন্ত্রণা। কথা বলা দূরস্থান, চোয়াল নাড়ালেও ব্যথা লাগে। আজ পঞ্চম দিন। ছড়াটা মন্ত্রের মতো জপ করেছি এই ক'দিন। অর্থ বোধ হয়নি। কিছু একটা ওযুধ তৈরি করে খেতে হবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কী খাব, কীভাবে খাব...।

"ঝিমঝিম করছে রোদ। একটা পেঁপে খেতে খুব ইচ্ছে করছিল। উপর দিকে তাকালাম। পেঁপেগাছের মাথাটা আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। উঠে গিয়ে লগা দিয়ে পেঁপে পাড়বার ক্ষমতাও চলে গিয়েছে। মৃত্যু এগিয়ে আসছে, আর নিস্তার নেই।

"মনের ভিতরটা কেমন ঠান্ডা হয়ে এল হঠাৎ। আসুক মৃত্যু। আর ছটফট করব না আমি। শয়তান লোকটা কোথাও যদি লুকিয়ে-লুকিয়ে আমায় দেখতে থাকে, তা হলে ওকে আনন্দ পেতে দেব না। শুধু, যদি একটা পেঁপে খেতে পেতাম! একটা পেঁপে... পায়ের পরে পা... পাপা... আ নয়কো এ...আ-এর বদলে এ... কী হল? পেপে... মানে পেঁপে! এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে... পেঁপেগাছ!

"হঠাৎ চেতনা ফিরে এল। এ কী ভাবছি আমি? আথুরিমশাইয়ের ছড়াটার অর্থ বোঝা যাচ্ছে। তবে কি... তবে কি... পেঁপেগাছ, তার তলায়, আধেক শরীর মাটির উপর, আধের শরীর নীচে... তার মানে আর-একটা গাছ!

"বাচ্চা দু'টো হাওয়ায় দোলে আগে এবং পিছে... সেই গাছটায় দু'টো ফল... আমার প্রায় অন্ধ দু'চোখ দিয়ে তখন জল ঝরতে শুরু করেছে। পেঁপেগাছের তলায় দু'টো ফলওয়ালা আর-একটা গাছের কথা বলেছেন আথুরিমশাই। গাছটা আমি দেখেছি। আমার ডান দিকে খানিকটা দূরেই রয়েছে। রোজই চোখে পড়েছে এ ক'দিন। কী গাছ ওটা চিনি না। উজ্জ্বল কমলা রঙের দু'টো ফল দুলছে ডালে। পাখিতে ছোঁয় না। কোনও বিষফল হবে হয়তো। হোক গে। বিষে বিষক্ষয়। হাতড়ে-হাতড়ে শরীরটা টেনে-টেনে ডান দিকে খানিক দূর এগোতেই গাছটার গায়ে হাত পড়ল। চোখে তখন একদম দেখতে পাচ্ছি না। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ধাঁধার রহস্যটা ভাঙবার উত্তেজনা তীব্র নেশার মতো আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। একটা ঘন অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে যেতে-যেতে ঠেকল একটা ফল... টান মেরে ছিঁড়তেই গলগল করে ঘন কষ ঝরে পড়ল ফল ধরে থাকা হাতে... মায়ের রক্ত... গাছ-মায়ের রক্ত, তার সঙ্গে ফলের শাঁস... ছেলের মাংস... অজ্ঞান হয়ে যেতে-যেতে কোনওক্রমে কষমাখা ফলটা ধরে মুখের কাছে আনতে পেরেছিলাম...

"একটা কষা, কটু স্বাদ ছড়িয়ে পড়ল মুখে। আগুনের স্রোত ছুটে যাচ্ছে আমার মুখ থেকে গলা হয়ে শরীরের কোনায়-কোনায়... তারপর আর কিছু মনে নেই।

"জ্ঞান ফিরতে দেখলাম, আথুরিমশাই মাথার কাছে বসে রয়েছেন। আমি পেরেছি... একা লড়াই করে রেড উইডোর বিষকে হারিয়ে দিয়েছি আমি! উঠে বসতে যাচ্ছিলাম, আথুরিমশাই আবার ধরে শুইয়ে দিলেন।

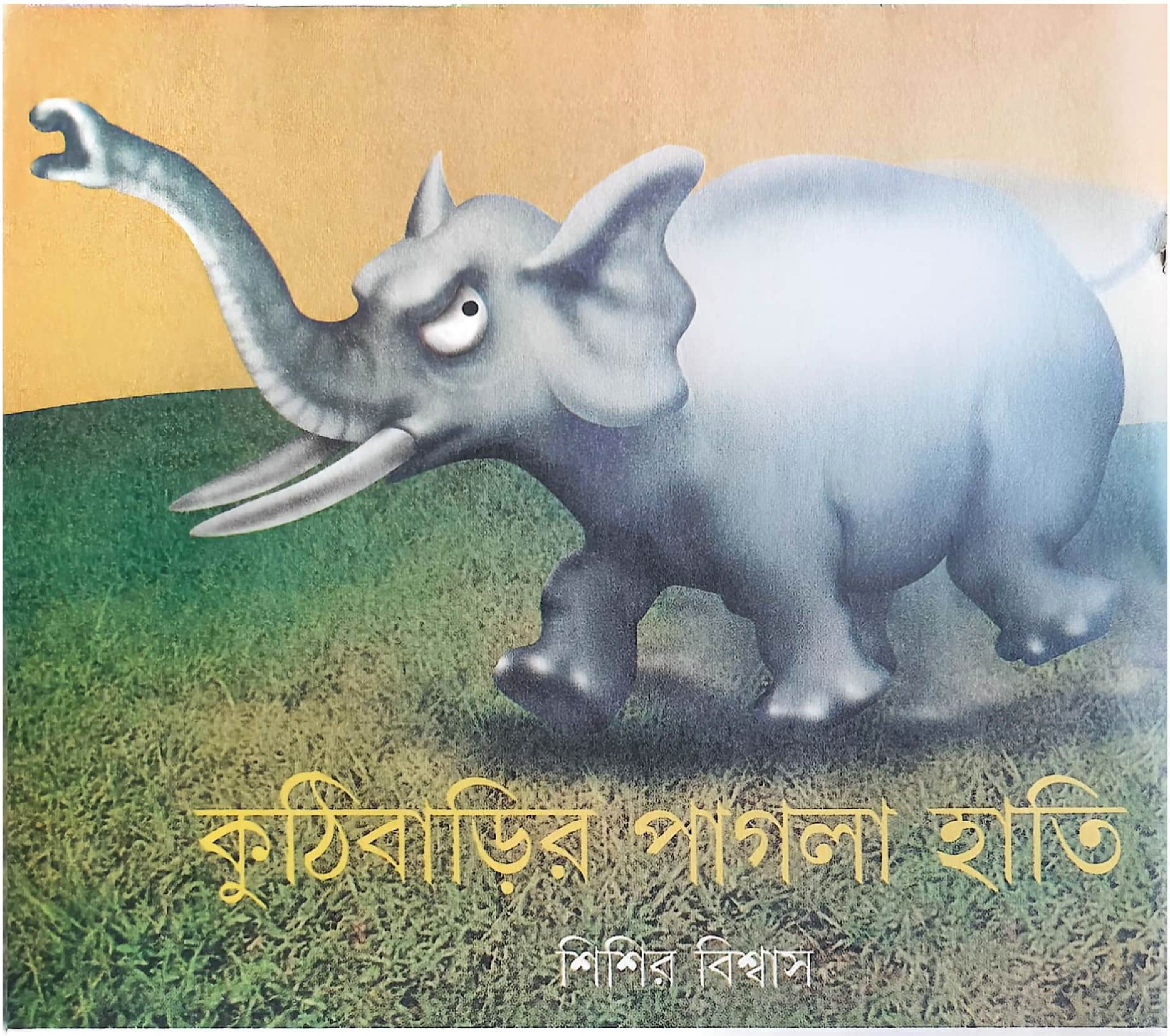
"এর পর পাঁচ বছর ওঁর সঙ্গে জঙ্গলে থেকে কাজ শিখেছি। তারপর হঠাৎ করেই একদিন ওঁর বিষতন্ত্রের পুঁথির তাড়া, পুষ্যি বিছে, মাকড়সা, পোকামাকড় আর নিজে কোথায় যেন চলে গেলেন। বন্ধনহীন পাগল মানুষ। কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, কিছু বলে যাননি। গ্রাম থেকে সপ্তাহের রসদ কিনে ফিরে এসে দেখি উনি নেই।"

"কিন্তু কাকা, তুমি যে বললে, জঙ্গলে রেড উইডো দেখেছ? এ তো আথুরিমশাইয়ের পোষা মাকড়সা! তা হলে?"

"পোষা তো কী হয়েছে? আমি বলেছিলাম, জলপাইগুড়ির জঙ্গলে রেড উইডো দেখেছি। পোষা না বুনো তা বলেছি নাকি? আর, এতদিনে আথুরিমশাই তো স্বর্গে গিয়েছেন। ওঁর পুষ্যি প্রায় শ'খানেক বিরল প্রজাতির বিষাক্ত মাকড়সা আর তাদের কাচ্চাবাচ্চাদের উনি ওই জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে যে যাননি, সে কথা কী করে জানবি? এদেরই নাতিপুতিরা কেউ-কেউ ট্রেনে চেপে বর্ধমানে চলে এলেই বা বারণ করবে কে? হতে পারে এই কলকাতাতেও, এমনকী তোদের এই ক্লাবঘরের দেওয়ালেও...।"

বলতে-বলতে কাকা একবার সিলিংয়ের দিকে তাকালেন। তাকিয়ে দেখি, ঘুরন্ত ফ্যানটার ঠিক উপরে, সিলিংয়ের গায়ে ধূসর রঙের, সাদা-সাদা ছিটছিট... অ্যাত্তবড় একটা... মাকড়সা!

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল



কুঠিবাড়ির পাগলা হাতি

শিশির বিশ্বাস

রাত দশটা নাগাদ বাসায় ফিরে রেঞ্জার মহাদেব রায় সবে ধড়াচুড়োগুলো খুলতে শুরু করেছেন, টেলিফোনটা বেজে উঠল। ডি এফ ও সাহেব নয়তো? ভাবতে গিয়ে বুকের ভিতরটা ফের ধড়ফড় করে উঠল মহাদেববাবুর। ওফ! সারাদিনে প্রায় ঝড় বয়ে গিয়েছে শরীর আর মনের উপর দিয়ে। সেই ভোরে বেরিয়েছিলেন, সামান্য বিশ্রামটুকুও মেলেনি আর। তারপর মিটিংয়ে ডি এফ ও সাহেবের চোখা-চোখা বাক্যবাণ। বেচারা উনিই বা আর কী করবেন। খোদ চিফ কনজারভেটর আসছেন। মন্ত্রীও নাকি আসবার কথা ভাবছেন। দু'-এক দিনের মধ্যে একটা হেস্তনেস্ত না করলেই নয়। সত্যি কথা বলতে কী, চাকরিজীবনে এমন পরিস্থিতির সামনে তিনি পড়েননি কখনও। অবশ্য এটা ঠিক যে, চাকরিজীবনের প্রায় অন্তিম লগ্নে যখন এই জঙ্গলমহলে পোস্টিং অর্ডার এল, তখনই বুঝেছিলেন কপালে দুর্ভোগ আছে যথেষ্টই। অথচ একদিন চাকরিজীবন শুরু করেছিলেন এখানেই। সামান্য এক বিট অফিসার হয়েও কাজ করেছেন দাপিয়ে। সুদীর্ঘ সময় তখন কাটিয়ে গিয়েছেন। ট্রান্সফার হয়েছিলেন একেবারে প্রমোশন নিয়ে। এ তল্লাট তাই প্রায় হাতের তালুর মতোই চেনেন। কিন্তু সেই সময়টা ছিল অন্য রকমের। বনদপ্তরের চাকরি আজকের মতো জটিল ছিল না এত। আসলে তখন বনদপ্তর যেমন ছিল, তেমনই বনও ছিল। বনের প্রাণী বনেই বাস করত। কাজটাও তাই সহজ ছিল অনেক। সেই পরিস্থিতিটাই আজ আর নেই। অরণ্যের পরিমাণ কমতে-কমতে প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। যেটুকু আছে তাও ঠিকাদার আর সাধারণ মানুষের বেআইনি কাজের দৌলতে প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। তাই যা ঘটবার ঘটতে শুরু করেছে। হাতির পাল আগেও ছিল অরণ্যে। বরং সংখ্যায় বেশিই ছিল কিছু।



কিন্তু কোনও দিন তারা বন ছেড়ে লোকালয়ে এসে হানা দিয়েছে শোনা যায়নি। আর দিলেও সেটা ব্যতিক্রমই ছিল বলা যায়। আসলে আকার-আয়তনে অরণ্য তখন বিস্তৃত ছিল অনেক। গাছপালা ছিল প্রচুর। হাতির পালের উপযুক্ত খাদ্যের অভাব ছিল না সেখানে। তাই গ্রামাঞ্চল তথা লোকালয়ে তাদের হানা দেওয়ার দরকারও হয়নি তেমন। সেটা শুরু হয়েছে গত বছর কয়েক ধরে ঝাড়খন্ড সীমানার অঞ্চলগুলোয়। বিশেষ করে এই ভরা ফসলের মরশুমে। তাও গোড়ার দিকে হাতির পালের গতিবিধি সীমান্ত অঞ্চলের দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইদানীং তারা নেমে আসতে শুরু করেছে আরও ভিতরের দিকে, ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে। শুধু ফসলই নয়, তাড়া খাওয়া ক্ষিপ্ত হাতির পালের আক্রমণে ভাঙছে ঘরবাড়ি, এমনকী ঘটেছে প্রাণহানিও। এ অবস্থায় পুরো দায়দায়িত্বটাই এসে পড়েছে বনদপ্তরের কর্মীদের উপর। সুতরাং বদলির অর্ডার পেয়েই বুঝেছিলেন শেষ সময়টা সুখের হবে না মোটেই। কিন্তু সেটা যে এতখানি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। যা কখনও হয়নি তাই ঘটে গিয়েছে এবার। মিডিয়ার দৌলতে তোলপাড় হয়ে গিয়েছে রাজ্য জুড়ে। শুধু ঘুম নয়, চাকরি বাঁচানোই দুষ্কর। ভাবতে-ভাবতে টেলিফোনটা তুললেন তিনি। না, ডি এফ ও সাহেব না, বিট অফিসার তপেশ্বর দাস। একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে যাবেন, ওদিক থেকে তপেশ্বর দাসের উত্তেজিত কণ্ঠ ভেসে এল, “সর্বনাশ হয়েছে স্যার। খুনেরোগ হাতি হানা দিয়েছে কুঠিবাড়ি গ্রামে। আজ সন্ধেতেই দু’জন শিকার হয়েছে তার। উত্তেজিত কয়েকশো মানুষ ঘিরে ফেলেছিল বিট অফিস। কোনওক্রমে বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়েছি এইমাত্র।”

তপেশ্বর দাস নতুন। সবে ঢুকেছে দপ্তরে। তবু কাজের ব্যাপারে উৎসাহ আছে ছেলেটার। ওই অবস্থায় পড়েও যে

কয়েকশো উত্তেজিত মানুষকে সামাল দিতে পেরেছে সেটা কম কথা নয়। "গুড," অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল মহাদেববাবুর, "দু'জন বেঁচে আছে তো?"

"আছে স্যার। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি সেখানেই আছি এখন। তেমন বুঝলে সদর হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে তবে ফিরব।"

"হাতি খেদাবার ব্যবস্থা হয়েছে কিছু?" মহাদেববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ রাতের মতো হয়েছে স্যার। তবে কেরোসিন যা জোগাড় করা গিয়েছে তাতে গোটা আষ্টেকের বেশি মশালের ব্যবস্থা হয়নি।"

সামান্য এক বিট অফিসারের পক্ষে এত দ্রুত এর বেশি আর সম্ভব নয় সেটা ভাল করেই জানেন মহাদেববাবু। গোটা কয়েক নির্দেশ দিয়ে নামিয়ে রাখলেন টেলিফোন। বছর কয়েক আগে হলে এ অবস্থায় উর্ধ্বতন অফিসার হিসেবে তিনি নিজেও ছুটতেন ফের। কিন্তু আজ পারছিলেন না আর। একে তো বয়স হয়েছে। তার উপর পুরো ব্যাপারটা ঠান্ডা মাথায় একটু খতিয়ে দেখা দরকার। এমন ঘটনা তাঁর চাকরিজীবনে ঘটেনি কখনও। হাতি চোরাশিকারিদের উৎপাত ডুয়ার্সে রয়েছে ভালই। কিন্তু এই অঞ্চলে শোনা যায়নি কখনও। অথচ একেবারে পেশাদারের কাজ। টেরটিও পায়নি কেউ। ঘটনাটা তিন দিন আগের। ফসলের এই সময়টাতেই ঝাড়খন্ড সীমানার ওদিক থেকে হানা দেয় হাতির পাল। খানিকটা সতর্কতা বনদপ্তর থেকে তাই নেওয়া হয় আগে থেকেই। ব্যতিক্রম হয়নি এ বছরও। খবরও আসছিল দাঁতালসহ ছোট একটা হাতির পাল নাকি দেখা যাচ্ছে মাঝে-মধ্যে। তবে তারা ফসলের খেতে হানা দেয়নি এখনও। ভয়ানক ব্যাপারটা ঘটে গেল এর মধ্যেই।

আগের রাতে কুঠিবাড়ি গ্রামের উত্তরে জঙ্গলের ভিতর থেকে গুলির আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল দু'-দু'বার। ইদানীং রাতে জঙ্গলের ভিতর উগ্রপন্থীদের আনাগোনার কথা শোনা যাচ্ছে। তাই মাথা ঘামায়নি কেউ। দুষ্কৃতীর দল সেই সুযোগটাই নিয়েছে। ভোর হতেই বোঝা গিয়েছে আসল ব্যাপারটা। ভয়ানক খবরটা বনদপ্তরের অফিসে পৌঁছতেও সময় লাগেনি বিশেষ। খবরটাকে ভয়ানক বললে বোধ হয় কমই বলা হয়। রাতে ওই জঙ্গলের ভিতর বিশাল এক দাঁতাল হাতিকে গুলি করে মারা হয়েছে। তারপর মাথার সামনের দিকটা শুঁড় সমেত কেটে ফেলে পুরো দাঁতজোড়া আমূল খুলে নেওয়া হয়েছে। এমন ব্যাপার চোরাশিকারিদের উৎপাত যেখানে সবচেয়ে বেশি, সেই ডুয়ার্সেও শোনা যায় না বিশেষ। হাতি হত্যা করার পর দাঁত দু'টি সাধারণত সামনে থেকে ভেঙে নেওয়া হয়। তাতে দাঁতের খানিকটা অংশ থেকে যায় ভিতরে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। মাথার সামনের দিকটা কেটে পুরো দাঁতটা খুলে নেওয়া হয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, রীতিমতো পেশাদারের কাজ। এভাবে দাঁত উপড়ে নিতে সময় লাগে অন্তত ঘণ্টাতিনেক, লোকও লাগে কয়েকজন। অথচ হাইওয়ে থেকে মাত্র কয়শো মিটার ভিতরে ঘটে গিয়েছে এই ব্যাপার। সুতরাং ঘুম ছুটে গিয়েছে বনদপ্তরের।

সন্দেহ নেই, বাইরের কোনও দলের কাজ এটা, তবে স্থানীয় মানুষও রয়েছে কিছু। তাদের মদত ছাড়া এ জিনিস সম্ভব নয় কিছুতেই। সমস্যাটা এখানেই। ভিতরে-ভিতরে এত বড় একটা চক্র কাজ করে চলেছে, টেরটিও পায়নি কেউ। না পুলিশ না বনদপ্তর। এমনকী গত তিন দিন তোলপাড় করেও হদিশ করা যায়নি কিছু। স্থানীয় ও সি জর্নাদন রায়ও কাজের মানুষ, চেষ্টার ত্রুটি করেননি। মহাদেববাবু এ ক'দিনে বার কয়েক দেখা করেছেন তাঁর সঙ্গে। শলাপরামর্শও হয়েছে অনেক। কিন্তু নিট ফল শূন্য। না পাওয়া গিয়েছে দুষ্কৃতীদের হদিশ, না পাওয়া গিয়েছে গজদন্ত জোড়া। তবে ও সি জর্নাদনবাবুর ধারণা জিনিস দু'টি এখনও আছে এখানে। পাচার হতে পারেনি। শুধু এই কারণে মহাদেববাবু এখনও আশার আলো দেখছেন কিছু। যদি চোরাই দাঁত দু'টি উদ্ধার করা যায়, আর সেই সঙ্গে দু'-একজন ধরা পড়ে তা হলেও সুরাহা হয় কিছু। নইলে সন্দেহ নেই, এ জিনিস ফের ঘটবে। গত তিন দিন ধরে তাই ঘুম নেই মহাদেববাবুর চোখে। তার উপর চিফ কনজারভেটর সাহেব আসছেন আগামী কাল, সঙ্গে খোদ মন্ত্রীরও নাকি আসার কথা রয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে সামান্য এগোনো যায়নি এখনও। তার মধ্যে আবার এই দুঃসংবাদ। রোগ বা দলছুট পাগলা হাতির ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তা হলে জল এর পর গড়াবে অনেক দূর। পুলিশের তৎপরতার কারণে একই গ্রামবাসী উত্তেজিত হয়ে রয়েছে যথেষ্ট। তার উপর এমন ব্যাপার আরও ঘটলে ঘুলিয়ে যাবে পুরো ব্যাপারটাই।

গত কয়েক রাত তবু দু' চোখের পাতা এক হয়ে ছিল সামান্য আজ তাও হল না আর। পর দিন ভোরেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তাই। ডি এফ ও সামন্তসাহেবের ফোন এল ওই সময়। টেলিফোন তুলতেই ওধার থেকে তাঁর অসহিষ্ণু গলা ভেসে এল, "কী খবর মিস্টার রায়?"

রোগ-হাতি ব্যাপারটা গত রাতেই জানিয়ে রেখেছিলেন মহাদেববাবু। শুধু বললেন, "তেমন কোনও খবর এখনও পাইনি স্যার। তবে তপেশ্বর দাস নিজে হাতি খেদাবার দলে রয়েছে।"

"গত কাল যে দু'জন আহত হয়েছিল তাদের খবর পাওয়া গিয়েছে কিছু?"

"পেয়েছি স্যার। একজনকে হেল্থ সেন্টার থেকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর-একজনকে ভর্তি করতে হয়েছে হাসপাতালে। তবে শুনেছি, মারাত্মক নয় তেমন। যাই হোক, আমি এখনই রওনা হচ্ছি স্যার। ভাববেন না।"

সামন্তসাহেব অবশ্য আশ্বস্ত হলেন না বিশেষ। তবে কথা বাড়ালেন না আর। নামিয়ে রাখলেন টেলিফোন। যথাসময়ে বের হলেও জিপের গোলমালে খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল মহাদেববাবুর। কিন্তু অকুস্থলে পৌঁছবার আগেই পথে যে সংবাদ পেলেন, তাতে ছুটতে হল উলটো দিকে, হাসপাতালের পথে। ভয়ানক ব্যাপার ঘটে গিয়েছে কুঠিবাড়িতে। গ্রামের উত্তরে শালবনে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে হাতিটা। রাতভর তাড়াবার অনেক চেষ্টা করেও সফল হওয়া যায়নি। ভোরের দিকে ঢিলে পড়েছিল সামান্য। সেই সুযোগেই বেরিয়ে এসেছিল আবার। অপ্রস্তুত মানুষগুলোর তিনজন জখম হয়েছে তার আক্রমণে। বিট অফিসার তপেশ্বর দাসও রয়েছে তাদের মধ্যেই। কাছেই পুলিশের গাড়ি ছিল। তারাই নিয়ে গিয়েছে হাসপাতালে।

দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়েই হাসপাতালে এসেছিলেন মহাদেববাবু। কিন্তু সব দেখে সামান্য হলেও স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল



বুক থেকে। না, ভয়ানক কিছু হয়নি কারও। এর ভিতর তপেশ্বর দাসের অবস্থাই খানিকটা খারাপ। কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার হয়ে গিয়েছে একটা পায়ে। একেবারে সামনে পড়ে গিয়েছিল প্রাণীটার। খ্যাপা হাতিটা মুহূর্তে শুঁড়ে পেঁচিয়ে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু ছুড়ে ফেলার আগেই পটকা আর ক্যানেস্তারার আওয়াজে সম্ভবত খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েই শিকারটিকে নামিয়ে পালিয়ে গিয়েছে জঙ্গলের ভিতর। হাসপাতালের বেডে শুয়ে আতঙ্কে তখনও কাঠ হয়ে রয়েছে মানুষটা। সান্ত্বনা দেবেন কী, বেডের পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে বড় অসহায় মনে হল রেঞ্জার মহাদেববাবুর। এই সংকট সময়ে তপেশ্বর দাসকেই সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল আজ। বড় সাহসী ছিল ছেলেটা।

হাসপাতালে সময় একটু বেশিই লাগল মহাদেববাবুর। দাঁড়িয়ে থেকে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করে যখন বের হলেন, তখন বেলা প্রায় এগারোটা। কাছেই একটা বুথে গিয়ে ফোন করলেন ডি এফ ও সাহেবকে। ভদ্রলোক ইতিমধ্যে সব খবরই পেয়ে গিয়েছেন। ফোন ধরেই রীতিমতো উত্তেজিত গলায় বললেন, "আপনি এখনই কুঠিবাড়িতে চলে যান মিঃ রায়। পরিস্থিতি এই মুহূর্তে ওখানে যথেষ্টই উত্তেজিত। ফের হামলা হয়েছে বিট অফিসে।"

খবরটা মহাদেববাবুও পেয়েছেন ইতিমধ্যে। বনদপ্তরের এটাই নিয়তি। হাতির পাল হামলা করে গ্রামে, ফসলের খেতে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ হামলা করে বনদপ্তরের উপর। কিন্তু আজ বিট অফিসারের এই অবস্থার পরেও এই ব্যাপার খানিকটা বাড়াবাড়ি বইকী? সন্দেহ নেই, উত্তেজনা ছড়াচ্ছে কিছু মানুষ। সুপরিকল্পিত ভাবে। শুধু বললেন, "ভাববেন না স্যার। থানার ওসিকে নিয়ে আমি রওনা হচ্ছি এখনই।"

সামন্তসাহেব অবশ্য শান্ত হলেন না কিছুমাত্র। একইরকম উত্তেজিত গলায় বললেন, "ভাবব না কী বলছেন! সামনে ইলেকশন। এর মধ্যেই জল গড়িয়েছে অনেক দূর। চিফ কনজারভেটর সাহেব মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন। বোধহয় রোগ-হাতিটাকে মেরেই ফেলা হবে এবার। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি নিজেও বেরিয়ে পড়ছি। হাতিটা এর মধ্যে যেন নতুন কোনও ঝামেলা না করে দেখুন সেটা।"

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে কুঠিবাড়িতে পৌঁছে মহাদেববাবুর বুঝতে অসুবিধে হল না পরিস্থিতি সত্যিই খুব জটিল। শালবনের ভিতর থেকে ইতিমধ্যে আরও কয়েকবার বের হবার চেষ্টা করেছে দাঁতালটা। আহত হয়েছে আরও কয়েকজন। তবে প্রাণহানি ঘটেনি কারও। জিপে আসার পথে এই ব্যাপারটা নিয়েই অনেকটা সময় মাথা ঘামিয়েছেন তিনি। কিন্তু থই করতে পারেননি। তার সুদীর্ঘ চাকরিজীবনে এমন ব্যাপার দেখেননি কখনও। খ্যাপা হাতি সাধারণত শিকারকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে ছুঁড়ে দেয়। নয়তো পায়ে পিষে ফেলে। মৃত্যু ঘটে যায় মুহূর্তে। দলছুট খ্যাপা হলেও এ হাতিটা তেমন কিছু করেনি এখনও। ভাবতে গিয়ে এখানে এসেই আটকে যাচ্ছেন শেষ পর্যন্ত। অবশ্য ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যাপারটা নিয়ে আর ভাববার সময় মেলেনি। ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আশু ব্যাপারগুলো নিয়ে। ও সি এবং গ্রামের প্রধান কয়েকজনকে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন খানিকটা। নতুন কিছু লোক নিয়ে হাতি খেদানোর দলটাকে জোরদার করা হয়েছে আরও। কিন্তু সুবিধে খুব একটা হয়নি। খ্যাপা হাতিটা এই অল্প সময়ের মধ্যেই হামলা করেছে আরও কয়েকবার।

অভিজ্ঞ মহাদেববাবু বেশ বুঝতে পারছেন ক্ষিপ্ত প্রাণীটা বের হতে চাইছে পশ্চিম শালবনের ভিতর থেকে। কিন্তু সীমানার ওধারে পাহাড় জঙ্গলের দিকে নয়। যেতে চাইছে পুবে ঘন লোকালয়ের দিকে। যেটা হতে দিলে সর্বনাশের শেষ থাকবে না আর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামল এক সময়। মহাদেববাবুর চিন্তায় পড়ে গেলেন বেশ। ও সি জনার্দনবাবু অবশ্য সঙ্গে রয়েছেন এখনও। তবু সামনে রাতের কথা ভেবে কপালের ভাঁজ বাড়ছিল আরও। ডি এফ ও সামন্তসাহেব এসে হাজির হলেন ওই সময়। সঙ্গে যে-মানুষটি তাঁর জিপ থেকে নামলেন, তাঁকে দেখেই ভুরু কুঁচকে উঠল মহাদেববাবুর। শিকারি ধূর্জটি চৌধুরী। সঙ্গে হেভি বোরের একটা রাইফেল। ধূর্জটি চৌধুরী নামী শিকারি। পাগলা হাতি শিকারে নানা জায়গায় এর আগেও তাঁর ডাক পড়েছে বার কয়েক। মহাদেববাবুর বুঝতে অসুবিধে হল না, আর ঝুঁকি না নিয়ে খ্যাপা হাতিটাকে মেরে ফেলার পরোয়ানা এসে গিয়েছে। কাছে যেতে ডি এফ ও সাহেব সেই কথাই জানালেন। সামান্য আলোচনাও হল এই নিয়ে।

এরপর আধ ঘণ্টাও হয়নি, রোদের তেজ খানিক কমে এসেছে আরও। হঠাৎ শালজঙ্গলের দিক থেকে হইহই শব্দ। পটকা আর ক্যানেস্তারার আওয়াজ। দেখতে-দেখতে বিশাল প্রাণীটা বেরিয়ে এল জঙ্গল ফুঁড়ে। শুঁড় তুলে তীব্র বেগে ছুটতে শুরু করল সামনে। ধূর্জটিবাবু ততক্ষণে জিপের পাশে দাঁড়িয়ে রাইফেল তুলে পজিশন নিয়ে নিয়েছেন। কথা ছিল, কাছে এলেই উলটো দিক থেকে তাড়া করা হবে প্রাণীটিকে, যাতে ধূর্জটিবাবুর দিকে মুখ ঘোরাতে বাধ্য হয় সে। অদূরে সাইকেল নিয়ে অপেক্ষমাণ মহাদেববাবুকে সেই নির্দেশই দিলেন তিনি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, মহাদেববাবু করলেন তার উলটো। তাঁর নির্দেশে মশাল হাতে একদল ছুটে এসে ধূর্জটিবাবুর দিক থেকে তাড়া করল হাতিটাকে। সুতরাং, উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে ছুটতে শুরু করল প্রাণীটা।

"এ কী করলেন মশাই?" চিৎকার করে উঠলেন ডি এফ ও সাহেব নিজেই।

"এ রোগ-হাতি নয় স্যার। তবে ঠেকানোও যাবে না আর। আমি যাচ্ছি পিছনে। চিন্তা করবেন না।" ডি এফ ও সাহেবকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সাইকেলে প্যাডেল মেরে পাশে ধানখেতে নেমে পড়লেন তিনি। বিশাল শরীর দুলিয়ে হাতি ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে খেত ভেঙে। পিছনে হাতি খেদানোর দল আর বনদপ্তরের কর্মচারীদের নিয়ে মহাদেববাবু। অবাক হয়ে ডি এফ ও সাহেব দেখতে থাকলেন রেঞ্জারবাবুর নির্দেশে চিৎকার থামিয়ে তারা ছুটছে পিছনে। এমনকী, মশালও নিভিয়ে ফেলা হয়েছে বেশ কয়েকটি।

বিশাল দেহ নিয়ে হাতি কী বিপুল গতিতে ছুটতে পারে মহাদেববাবু ভালই জানেন সেটা। দাঁতালটা অবশ্য আস্তেই ছুটছিল অনেক। মাঝে-মধ্যে শুঁড় দুলিয়ে গন্ধ শুঁকছিল বাতাসের। তবু পিছনে দলবল নিয়ে তাল রাখতে পারছিলেন না

তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণীটা উঠে এল কুঠিবাড়ি গ্রামের পথে। আতঙ্কে গ্রামের মানুষ তখন বেরিয়ে এসেছে বাইরে। পিছনে মহাদেববাবু তাঁর দলবল নিয়ে সমানে হুঁশিয়ারি দিয়ে চলেছেন, হাতির সামনে গিয়ে না পড়তে।

অদ্ভুত ব্যাপার, পিছনে এত মানুষ, হাতির কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই কোনও দিকে। আক্রমণও করেনি কাউকে। তবে গতি কমেছে কিছু। ইতিমধ্যে ডি এফ ও সামন্তসাহেবের সঙ্গে শিকারি ধূর্জটিবাবু সড়ক পথে জিপে চলে এসেছেন পিছনে। ওসি সাহেবও রয়েছেন। এই ভিড়ের মধ্যে ওদের সকলেই তখন প্রায় দর্শকের ভূমিকায়।

কুঠিবাড়ি গ্রামটা ছোট নয় খুব। বর্ধিষ্ণুও বটে। পথের পাশে ধানের মরাই, বাগান আর কলার ঝাড়। আনাজের খেতও। হাতিটা ফিরেও তাকাল না কোনও দিকে। শুধু এক পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে শুঁড় নামিয়ে জল খেল অনেকটা। পিছনে মানুষের ঢল ততক্ষণে বেড়েছে আরও। অনেকের হাতেই লাঠিসোঁটা। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সকলে। সকলের আগে মহাদেববাবু। ইতিমধ্যে ডি এফ ও সামন্তসাহেব পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। চাপাগলায় বললেন, "আপনার অনুমান হয়তো ঠিক, মিস্টার রায়। কিন্তু দাঁতালটা গ্রামের ভিতর ঢুকে পড়ল দেখছি!"

আশঙ্কাটা মহাদেববাবুর ভিতরেও তখন পাক খেতে শুরু করেছে। সন্দেহ নেই, ঝুঁকি একটু বেশিই নিয়ে ফেলেছেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁতালটা যে এভাবে গ্রামে ঢুকে পড়বে, তাও ভাবতে পারেননি। এরপর কিছু ঘটে গেলে কৈফিয়ত নেই কোনও। বনদপ্তরের ঘাড়েই চাপবে তার দায়। উত্তেজিত কিছু মানুষের মুখে ইতিমধ্যে শোনাও যাচ্ছে সে কথা। সামন্তসাহেবের কথায় সামান্য ঘাড় নেড়ে শুধু বললেন, "অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই স্যার। তবে সামনে গিয়ে না পড়লে বা চলার পথে বাধা না দিলে বিপদের কিছু নেই এটুকু বলতে পারি।"

সামন্তসাহেব কোনও কথা বললেন না আর। জল খাওয়া শেষ করে হাতিটা উঠে এল একসময়। শুঁড় দুলিয়ে ফোঁস-ফোঁস করে বাতাস টানল বার কয়েক। তারপর দুড়দাড় শব্দে মাটি কাঁপিয়ে ছুটতে শুরু করল হঠাৎ।

সম্পন্ন গৃহস্থ বিপিন বোসের বাড়িটা গ্রামের এক প্রান্তে। অনেকটা জমি নিয়ে পাঁচিল ঘেরা দু'তলা নতুন পাকা বাড়ি। উঠোনে মস্ত ধানের গোলা। দাঁতালটা সেই বাড়ির সামনে এসে থামল হঠাৎ। তীব্রস্বরে বারকয়েক ডেকে উঠল শুঁড় তুলে। তারপর শুঁড়ের এক ঠেলায় নিমেষে পাঁচিল ভেঙে ঢুকে পড়ল ভিতরে। বিপিন বোস বাড়িতেই ছিলেন তখন। গোলমালের শব্দে তখন দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে ভারী একটা বন্দুক। নীচে হাতিটা তখন তাঁর মস্ত ধানের গোলা তছনছ করে ফুঁসছে সমানে। উন্মত্ত হয়ে উঠছে ক্রমশ। একতলার দেওয়ালে এসে ঢুঁ মারছে ঘন ঘন। দারুণ শব্দে কেঁপে উঠছে বাড়ি। উপরে সেই দৃশ্য দেখে বিপিন বোস কেমন থতমত খেয়ে গেলেন হঠাৎ। হাতের বন্দুক হাতেই ধরা রইল। ফ্যাকাশে মুখে শুধু ঠোঁট চাটলেন বারকয়েক। তারপর হঠাৎই চোখ পড়ল ওসি জনার্দনবাবুর দিকে। থানার বড়বাবুর সঙ্গে ভালই পরিচয় আছে তাঁর। সেই সুবাদে খানিকটা সাহস ফিরে পেলেন যেন। কাঁপা গলায় বললেন, "ক-কিছু একটা করুন দারোগাবাবু। মেরে ফেলবে যে!"

জনার্দনবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। পাশে মহাদেববাবু বললেন, "ও সি সাহেব, ওই বন্দুকটার কি লাইসেন্স আছে ওঁর?"

ব্যাপারটা জনার্দনবাবুরও নজর এড়ায়নি। সম্পন্ন গৃহস্থ বিপিনবাবুর বন্দুকের লাইসেন্স আছে বটে, তবে সেই আগ্নেয়াস্ত্র এটা নয়। অনেক বেশি ভারী আর মজবুত। চেঁচিয়ে বললেন, "বিপিনবাবু, আপনার লাইসেন্সওয়ালা বন্দুক তো এটা নয়। পেলেন কোথায়?"

"অ্যা, হ্যাঁ?" প্রায় ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন বিপিনবাবু।

"হ্যাঁ বিপিনবাবু। বন্দুকটা আপনার নয়। তা ছাড়া খবর পেয়েছি দিনকয়েক হল জনাকয়েক নতুন কুটুম এসেছে আপনার। বেআইনি অস্ত্রটা...'

কথা শেষ হল না। হাতির শুঁড়ের ধাক্কায় নীচের পিলার ভেঙে দোতলার বারান্দার খনিকটা অংশ ভেঙে পড়ল সশব্দে। মেয়ে-পুরুষের চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল উপর থেকে। ওদিকে নামার পথও বন্ধ। বারান্দায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে বিশাল প্রাণীটা।

ঝুঁকিটা এমন খেটে যাবে মহাদেববাবু নিজেও আশা করতে পারেননি। হাতিটা খুনে নয়, মাত্র এই অনুমানেই ঝুঁকিটা নিয়েছিলেন তিনি। নইলে বুনো হাতি এমন ব্যাপার ঘটাতে পারে, দেখা তো দূরের কথা, কেউ শোনেনি কখনও। তবে সেসব নয়, পরের ব্যাপারটা কী করে সামলানো যায় তাই ভাবছিলেন তিনি। ওসি জনার্দনবাবু বললেন, "আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয় রেঞ্জার সাহেব। মেনি থ্যাঙ্কস। সন্দেহ নেই, হাতিটা এই জন্যই জঙ্গল থেকে বের হতে চাইছিল না। কিন্তু বাড়িটা এখনই সার্চ করার দরকার যে!"

ও সি যা বলতে চাইছেন, মহাদেববাবু সেটাই ভাবছিলরেন এতক্ষণ। মৃদু হেসে বললেন, "চেষ্টা করছি স্যার।"

বিশাল আকারের দাঁতালটাকে ফের তাড়া করে নিরাপদ জঙ্গলে ফেরানো সহজ ব্যাপার নয় মোটেই। মহাদেববাবুর নিজেরও সন্দেহ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তাঁর নির্দেশে হাতি খেদানোর দল বেশ সক্রিয় হয়ে উঠতেই খানিকটা থমকে গেল প্রাণীটা। ততক্ষণে গোটাকয়েক নতুন মশাল জ্বলে উঠেছে আরও। পটকা আর ক্যানেস্তারার আওয়াজও বেড়েছে। তবু ভয় ছিল, হাতিটা আরও খেপে উঠবে হয়তো। কিন্তু তেমন কিছু হল না। সমবেত তাড়ায় হাতিটা পিছু হঠল এবার। রণে ভঙ্গ দিয়ে ফেরার পথ ধরল শেষ পর্যন্ত। গ্রাম পার হয়ে মাঠে নেমে সোজা সেই শালজঙ্গলের দিকে।

মহাদেববাবু যখন দলবল নিয়ে হাতি খেদাতে ব্যস্ত, ততক্ষণে ও সি জনার্দনবাবু তাঁর বাহিনী নিয়ে শেষ কাজে নেমে পড়েছেন। বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই বিপিনবাবুর চার কুটুমকে পাওয়া গেল একটা ঘরের ভিতর। দারুণ আতঙ্কে তখন কাঠ হয়ে রয়েছে সকলে। বিপিনবাবুসহ তাদের সামান্য জেরা করতেই বাড়ির এক কুঠুরি থেকে বের হল সদ্য কাটা প্রমাণ সাইজের সেই গজদন্তজোড়া।

ব্যাপারটা নিয়ে সেসময় হইচই হয়েছিল কম নয়। রিটায়ারের আগে প্রোমোশনও পেয়ে গিয়েছিলেন মহাদেববাবু।

ছবি: সৌরীশ মিত্র

ভয়ংকর এস এম এস

গোবিন্দ চক্রবর্তী



ঠিক বিকেল পাঁচটায় ফোনটা বেজে উঠল। প্রবাল তখন কম্পিউটার ক্লাস থেকে ফিরে গা-এলিয়ে বসেছে টিভির সামনে। সবে উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে। এবার কলেজে ঢোকার পালা। মনটা তাই খুশিখুশি।

এমন সময় ভাস্করের ফোন, "কী রে প্রবাল! কী করছিস? দিন দুয়েকের জন্য হাজারিবাগ যাচ্ছি। যাবি নাকি?"

"কবে?"

"এই তো আজই। রাতের ট্রেনে। আজ শুক্র, মাঝে শনি-রবি থেকে, সোমবার ব্যাক।"

"কে কে যাচ্ছিস?"

"আমি, সুহেল, সপ্তর্ষি আর তুই যদি যেতে চাস, তা হলে তুই।"

খবরটা শুনেই প্রবাল উত্তেজনায় টগবগ করতে লাগল। এক বিন্দুও না ভেবে সম্মতি জানিয়ে দিল, "যাব না মানে! নিশ্চয়ই যাব।" বলেই সে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। ওসব ঠিক আছে।"

"কিন্তু টিকিটের কী হবে? এত অল্প সময়ে টিকিট কি আর পাওয়া যাবে?" একটু উদ্বেগ ফুটে উঠল যেন প্রবালের গলায়।

ভাস্কর একটু দোনোমনো করে বলল, "আসলে তীর্থর যাওয়ার কথা ছিল আমাদের সঙ্গে। পরীক্ষায় ফেল করে সে বিপাকে পড়েছে। বাড়ির লোক ছাড়তে রাজি হচ্ছেন না ওকে। কিন্তু তীর্থ গোঁ ধরে আছে, যাবেই। একটু আগে ও ফোন করেছিল। বলল, 'তোরা এগিয়ে যা। প্রতুলদের বাংলোর ঠিকানা আমি জানি। দেখবি, ঠিক পৌঁছে যাব।' যাকগে! ও যা ভাল বোঝে করুক।" বলেই সে একটু থামল। তারপর প্রবালকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে জানাল, "অত চিন্তার কী আছে! তীর্থর টিকিটটা তো আছেই। ওর টিকিটেই তুই যাবি।" এর পর ভাস্কর, কখন কোথায় দাঁড়াতে হবে সবিস্তার সব জানিয়ে ফোনটা ছেড়ে দিল।

ট্রেনে বসে একভাঁড় চায়ে চুমুক দিতে না-দিতেই হাতিয়া এক্সপ্রেসটা দুলে উঠল। ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক দশটা কুড়ি। সিটের উপর কাগজ পেতে

ডিনারের পসরা সবে সাজিয়ে বসেছে, এমন সময় টিটিসাহেব হাজির। টিকিট দেখেই তিনি বললেন, "এ কী! তোমরা দেখছি ভুল কোচে উঠে পড়েছ। এটা এস-ওয়ান। তোমাদের টিকিট এস-সেভেনে। কী ব্যাপার?" ভুরু কুঁচকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন চার বন্ধুকেই।

ওরা চারজনই ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে, মাথা নিচু করে। ভাস্কর আলতো করে মাথাটা তুলে জানাল, "সরি! ভুল হয়ে গিয়েছে। আমরা বুঝতে পারিনি। আসলে টিকিটের ছাপাটাও তেমন স্পষ্ট নয়। ঠিক আছে। আমরা তা হলে এস-সেভেনে চলে যাচ্ছি।"

টিটিসাহেব ভদ্রতা দেখিয়ে বললেন, "না না। এক্ষুনি না গেলেও চলবে। তোমরা খেয়ে নাও, তারপর যেও। এখানে খড়্গপুর স্টেশন থেকে যাত্রী উঠবে।" বলেই টিটিসাহেব চলে গেলেন।

ওরা ধীরেসুস্থে নিশ্চিন্ত মনে খেতে লাগল। খেতে-খেতে নানান কথা উঠল। তীর্থর কথা, কলেজে ভর্তির কথা, হাজারিবাগের কথা। তারপর যেই না এস-সেভেনের কথা মনে পড়েছে, তখন রাত গড়িয়ে এগারোটা। অমনই একটা কোচ থেকে আর-একটা কোচ টপকে ওরা পৌঁছে গেল এস-সেভেনে। গিয়ে দ্যাখে, ওদের সিট সব দখল হয়ে গিয়েছে। যারা দখল করেছে, তারা তখন নাক ডাকাচ্ছে মহানন্দে। ওরা তখন ঘুমন্ত মানুষগুলোকে জাগাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কেউ তো সাড়াই দিচ্ছে না।

হঠাৎ এক টিটিসাহেব ফিরে যাচ্ছিলেন ওদের পাশ দিয়ে। অমনই ভাস্কর ডেকে উঠল, "স্যার শুনছেন, এঁরা আমাদের জায়গা আটকে রেখেছেন। এই দেখুন আমাদের টিকিট।" বলতে-বলতে ভাস্কর টিকিটটা ধরিয়ে দিল টিটিসাহেবের হাতে।

টিকিটটা হাতে নিয়ে টিটিসাহেব তাকিয়ে রইলেন সবিস্ময়ে, "এ কী। তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি তো এখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে এদের সিট অ্যালট করে দিয়েছি। ভেবেছি, এই সিটের যাত্রীরা কেউ আসেনি।"

ওদের ধড়ফড়ে বুকটা আরও ধড়ফড় করে উঠল। কাঁচুমাচু করে টিটিসাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল। মুখে একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব। ভাস্কর বড় করুণ সুরে বলল, "বুঝতে পারিনি একটা ভুল কামরায় উঠে পড়েছিলাম।"

প্রবাল মাথা নিচু করে বলল, "মিসটেক হয়ে গিয়েছে। এখন কোনও একটা উপায় করে দিন স্যার।"

"উপায়? নো উপায়। পুরো ট্রেনটাই একেবারে প্যাক্‌ড। কোথাও কোনও গ্যাপ নেই।" বলতে-বলতে তিনি হাতের চার্টটা উলটেপালটে দেখতে লাগলেন। দেখতে-দেখতে বললেন, "তোমরা দরজার ওপাশটায় একটু অপেক্ষা করো, দেখি কী করতে পারি।" বলেই গটগট করে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে ওদের চারজনকেই একটা এসি কামরায় জায়গা করে দিলেন।

সাতসকালেই ট্রেনটা রাঁচি স্টেশন ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল হাতিয়ার দিকে। আকাশের ভাবভঙ্গি ঠিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। যে-কোনও মুহূর্তেই বৃষ্টি আছড়ে পড়তে পারে। একটা গাড়ি রিজার্ভ করে ওরা চটপট উঠে পড়ল। স্টেশন থেকে পিচ রাস্তাটা ন্যাশনাল হাইওয়েতে এসে মিশেছে। কিছুটা এগোতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। প্রথমে ঝিরঝিরে। তারপর মুষলধারে। গাড়ির চাকা ছুটছে শাঁই শাঁই করে।

ড্রাইভার ছেলেটি খুব বেসামালভাবে গাড়ি ছোটাচ্ছে। যতই ওকে নিষেধ করা হচ্ছে, সে ততই স্পিড বাড়িয়ে দিচ্ছে। সামনে বসে আছে সপ্তর্ষি, সমানে সে উসকে দিচ্ছে ছেলেটিকে। গাড়িটা রামগড় পেরিয়েছে সবে। বৃষ্টির পরিমাণও কিছুটা কমে এসেছে। ছেলেটির পিছনে একটা ম্যাটাডোর। সাইড ছাড়বার জন্যে ম্যাটাডোরটি হর্ন দিচ্ছে। ছেলেটি কিছুতেই জায়গা ছাড়বে না। সমানে নাচাচ্ছে তাকে। ম্যাটাডোরটিও নাছোড়। সে ওভারটেক করবেই। করতে গিয়ে সে ওদের গাড়িটিকে মারল এক ধাক্কা। ব্যস! আর-একটু হলেই ওদের গাড়িটি ছিটকে পড়ছিল বিরাট একটা হাইড্রেনে। ভাগ্যিস, সামনে ইঞ্চি তিনেক জায়গা ছিল, নইলে হাজারিবাগে হাজির হওয়াটা গনফট হয়ে যেত।

এই ঘটনার পর থেকে ছেলেটি বেশ সর্তক হয়ে গেল। রাজারাপ্পায় পৌঁছে ওদের সে ছিন্নমস্তার মন্দির দেখাল।

শরতের মেঘ এই আছে এই নেই। আবহাওয়াটাও বিলকুল বদলে গিয়েছে। গাড়ি যতই ছুটছে, ওদের মনটাও ততই ছটফট করছে হাজারিবাগের জন্যে। বেশ খানিকটা চড়াই পেরিয়ে ওরা ঢুকে পড়ল হাজারিবাগ শহরে। আশপাশে খোঁজখবর করতেই ওরা বাংলোর নিশানা পেয়ে গেল।

বাংলোটা বেশ বড় এবং পুরনো আমলের। ভিতরে ফুলের বাগিচা। ফুল এখানে সর্বত্রই। হাজারিবাগের অর্থটা মালুম হল এবার। বাংলোয় সব সময়ের জন্য একজন কেয়ারটেকার কাম কুক আছে। সকলেই তাকে 'সিংহজি' বলে ডাকে।

ঘরের দরজা-জানলা বোধ হয় অনেক দিন খোলা হয়নি। তালাচাবি খুলতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এল। ঘরের ভিতরে একটা বিশাল খাট, ওয়াড্রোব, চেয়ার-টেবিল, টিভি, কোনও কিছুরই অভাব নেই। খিদেয় পেটের ভিতরে ডাক দিচ্ছিল চোঁ-চোঁ। সিংহজি কেমন করে আঁচ করল কে জানে। সে বলল, "বাবু, আপনারা হাতমুখ ধুয়ে নিন। আমি জলখাবারের ব্যবস্থা করছি।"

সিংহজি অবশ্য বেশিক্ষণ সময় লাগাল না। জলদি-জলদি সে চা আর ডিম-টোস্ট নিয়ে হাজির।

"বাঃ।" চারজনই একসঙ্গে তারিফ করে উঠল সিংহজির।

এখানে আবার নতুন মোবাইলটা নাড়াচাড়া করতে-করতে সুহেল বলল, "কী রে! কিছু ঘটবে না তো?"

"কেন?" প্রবাল অবাক চোখে জিজ্ঞেস করল।

"না, এমনই বলছি। কাল থেকে একটার পর একটা যা ঘটছে।"

প্রবাল এবারে দুম করে বলল, "কেন, কেন? স্লিপারের টিকিট কেটে এসি কামরায় চড়াটাকে তুই বুঝি বিপদ ভাবিস?" সুযোগ পেয়ে প্রবাল একটু ঠুকে দিল ওকে।

ভাস্করও ওকে কথা শোনাতে ছাড়ল না। বলল, "ঠিকই তো! বাইরে বেড়াতে এসে যদি ডামাডোলই না হল, তা হলে অমন বেড়িয়ে লাভ কী?"

সুহেল একেবারে চুপ। মুখ গোঁজ করে খেতে লাগল। তাই দেখে ভাস্কর ওকে বলল, "চল। আমরা খেতে-খেতে



গল্প

বাগানটা একটু ঘুরে আসি।"

চারদিকে নির্মেঘ আকাশ। মনে হয় যেন মাথার উপরে নীল সমুদ্র। প্রকৃতিপ্রেমিক প্রবাল এধারে-ওধারে অবাধে বিচরণ করছে।

দুপুরের খানাপিনাও জমল ভালই। খেতে-খেতে ওরা হাজারিবাগ শহরে কোথায় কী আছে জেনে নিল সিংহজির কাছ থেকে। খাওয়াদাওয়া সেরে দে-ছুট। একেবারে মুক্ত পাখির মতো।

রাতে ফিরে ফের আড্ডা বসল বাগানে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। বেশ মায়াবী লাগছে জায়গাটাকে। আড্ডার ফাঁকে-ফাঁকে ধূমায়িত চা আর পকোড়া চলে আসছে।

প্রবাল বলল, "এই মওকায় ঘাটশিলাটা মেরে দিবি?"

ঘাটশিলার নাম শুনে সুহেল, সপ্তর্ষি নেচে উঠল। ভাস্কর ওদের আশ্বস্ত করে বলল, "আমারও তো যাওয়ার ইচ্ছে। কিন্তু ওই তীর্থটাই তো মাটি করে দিল সব।"

"কেন, কেন?" চারজনই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

"জানিস না। তীর্থর মাসিরবাড়ি তো ঘাটশিলায়। ও নিজেই প্রস্তাব দিয়েছিল মাসিরবাড়ি বেড়িয়ে আসবার জন্য। এখন সময় মতো বাবু দে-ডুব।"

"আহা! ও যেন জেনে বসে ছিল পরীক্ষায় ফেল করবে।" সুহেল তীর্থর হয়ে ওকালতি করল।

ওর কথায় সপ্তর্ষি দুম ফটকা এক শট চালাল। বলল, "ও পাশ করবে কী রে? পড়াশোনা করবে না, রাতদিন ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে। ধুস। মাথায় কিছু আছে নাকি ওর? ঠিক আছে, ওর পড়াশোনার কথা নয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু খেলাধুলোয়, সেখানে কেন অমন করে হারে? শুধু ওর বাকতাল্লাই। আরে! ওসব লেকচার-ফেকচার দিয়ে কখনও কলেজে ঢোকা যায় না। ও যদি না আসে, কহি বাত নেহি। আমরা নিজেরাই চলে যাব।"

ওদের কথাবার্তার ফাঁকে কখন যে সিংহজি এসে হাজির, কেউ টেরও পায়নি। সে হাত কচলে বলল, "বাবু, সাড়ে দশটা বাজে। আপনারা এবার খেয়ে নিন। বেশি রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবেন না। সকাল-সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ুন। আজ আমি একটু গাঁয়ের বাড়িতে যাব।"

বাধ্য ছেলের মতো ওরা খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরে ঢুকেই সুহেল টিভি চালিয়ে দিল। খানিকক্ষণ দেখার পর আর ভাল লাগল না। তখন টিভি বন্ধ করে তাস বের করল। সবে তাস গুছিয়ে খেলতে বসেছে, এমন সময় দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল। ভাস্কর জিজ্ঞেস করল, "কে? সিংহজি নাকি?"

কোনও সাড়া নেই। ফের ঠকঠক করে কড়া নাড়ার শব্দ। "কে?" চারজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

আশ্চর্য! সাড়া দিচ্ছে না কেন? প্রবাল ঝপ করে উঠে দরজাটা খুলে দিল। খুলতেই দেখল, তীর্থ দাঁড়িয়ে আছে কোমরে হাত দিয়ে।

"এ কী রে! তুই এত রাতে! কোন ট্রেনে এলি? যাকগে, এসে ভালই করেছিস। আমাদের ঘাটশিলাটা তা হলে বেড়ানো হয়ে যাবে।"

তীর্থর মুখে কথা নেই। তীর্থটা এমনই। সকলকে চমকে দিতে ওস্তাদ।

"সত্যি, তুই আমাদের ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলি। কিন্তু! এত রাতে তুই কোত্থেকে এলি?" ভাস্কর শঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল।

তীর্থ কোনও উত্তর দিল না। মিটিমিটি করে হাসছিল। তাই দেখে সুহেল, সপ্তর্ষি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী রে তীর্থ! তুই কথা বলছিস না কেন? এনিথিং রং?"

তীর্থ মাথা নেড়ে কী বোঝাল, কে জানে। তারপরই হাত বাড়িয়ে দিল তাসের দিকে। বলল, "দে, আমিও একহাত খেলি।"

ওর তাস ধরবার কায়দা দেখে চারজনই হো-হো করে হেসে উঠল। সুহেল একটু উপহাস করে বলল, "তাস ধরতেই শিখলি না এখনও, খেলবি কী?"

তীর্থ কোনও ভ্রুক্ষেপই করল না। তাস সাজিয়ে সে কল হাঁকিয়ে দিল। ওরা ঠিক তীর্থকে আমল দিল না। যেমন-তেমন ভাবে তাস চালতে শুরু করল। তীর্থ ভেরি সিরিয়াস। সে পটাপট তাস জিতে নিল। এবারে ওরা চমকে উঠল। ভাস্কর বলল, "এ কী রে, তুই তো দেখছি আমাদের হারিয়ে দিলি। ঠিক হ্যায়। ফের একদান হয়ে যাক। তারপর তোর দেরি করে পৌঁছবার গল্প শুনব।"

পরের দানেও ঠিক তাই। ওরা তীর্থর সঙ্গে পেরে উঠল না। যত দান খেলল সবক'টায় হেরে ভূত হল। না পেরে তখন ভাস্কর বলল, "দুর ছাই! তোর সঙ্গে আর তাস খেলছি না।"

তাসের বদলে প্রবাল এবার দাবার ঘুঁটি সাজাল। তীর্থর কাছে সে হারের বদলা নেবেই। সকলেই জানে প্রবালের সঙ্গে দাবায় কেউ সুবিধে করতে পারবে না। গতবার ও দাবায় ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসেছে।

প্রবাল একটু হাল্কা চালে দু'-এক দান চালাল। কিন্তু তীর্থ গম্ভীর। খুব ব্যক্তিত্বপূর্ণ দেখাচ্ছিল ওকে। সকলেই গভীর উৎসাহে দাবার কোর্টে তাকিয়ে আছে, কতক্ষণে তীর্থর হেরোমুখ দেখতে পাবে। কিন্তু না। তিন দানেই তীর্থ প্রবালকে কিস্তিমাতে ফেলে দিল। প্রবাল শত চেষ্টা করেও পারল না জিততে। একবার, দু'বার নয়, যতবার প্রবাল খেলেছে ততবারই সে হেরেছে। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে প্রবাল রেগেমেগে দাবার ঘুঁটি ছুড়ে ফেলে দিল। বলল, "না। আমি ওর সঙ্গে খেলব না কোনওমতে।"

এই কথা শুনে তীর্থর কী হাসি। যেন সে যাত্রাপার্টির হাসি উপহার দিতে এসেছে এখানে। সুহেল চোখ রাঙিয়ে বলল, "তোর অমন লম্বা-চওড়া হাসির মানে কী? খেলায় হার-জিত থাকে, তাই বলে তুই দাঁত মেলে হাসবি? ঠিক আছে, তোর হিম্মত থাকে তো আমার সঙ্গে গানের লড়াইয়ে লড়। দেখি তোর ক্ষমতা কত!"

"উত্তম প্রস্তাব।" এক কথায় তীর্থ রাজি হয়ে গেল। বলল, "ঠিক আছে। তোরা চারজন, আমি একা।"

তীর্থর অমন ভাবভঙ্গি দেখে ওরা ক্রমশ বিস্মিত। মনে-মনে ভাবল, ছেলেটার তো খুব দম্ভ হয়েছে দেখছি, পরীক্ষার সময় যে আমাদের খাতা দেখে নকল করে। খেলাধুলোয় যে কোনও দিন হারা ছাড়া জেতার মুখ দেখেনি, তার এত অহংকার! ঠিক আছে, এর সমুচিত জবাব দেব আজ। হয়ে যাক লড়াই।

সুহেল একটা গান ধরল, সেই গানটা শেষ হল 'চ' দিয়ে।

চকিতে তীর্থ 'চ' দিয়ে চারটে গান গেয়ে শুনিয়ে দিল। রীতিমতো সুর-তাল ছন্দ বজায় রেখে বড় গাইয়েদের মতো ভাব করে।

তাই দেখে ওরা সকলেই থ'। তীর্থ এত ভাল গান গায় কই শুনিনি তো কখনও।

গান শেষ করে তীর্থ বলল, "তোরা 'থ' দিয়ে একটা গান গেয়ে শোনা তো।"

'থ'-এর নাম শুনে ওরা থমকে রইল। 'থ' দিয়ে একটা গানও কারও মনে এল না। তীর্থ কিন্তু শুনিয়ে দিল। ওরা হকচকিয়ে গেল একেবারে। ভাস্কর কী একটা বলতে যাচ্ছিল। তীর্থ ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তুই নিশ্চয়ই বলবি কেমন করে আমি এত ভাল গান গাইলাম, তাই তো? তবে শুনে রাখ, আজকের রাশিফলে আমার বিজয়ীর সম্মান আছে। তোরা কেউ হারাতে পারবি না আমাকে।"

ভাস্কর তখন মান বাঁচাতে খেলা ছেড়ে টিভি খুলে বসল। প্রবাল আর সুহেল মোবাইলে গেম প্র্যাক্টিস করতে লাগল। রিমোট টিপে ভাস্কর স্পোর্টস চ্যানেলে পৌঁছতে চাইছিল।

তীর্থ দুম করে বলল, "টোয়েন্টি-সেভেনে চলে যা, ওখানে পাকিস্তান বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলা চলছে।"

ভাস্কর মুখটা গোমড়া করে বলল, "তোকে কে বলেছে, আমি খেলার চ্যানেল খুঁজছি? আমি নিউজ খুঁজছি।"

"ওঃ নিউজ? তা হলে তিন, দশ, পঁচিশ যে-কোনও একটা চ্যানেলে চলে যা, ওখানে নিউজ পেয়ে যাবি।"

রিমোট টিপে ভাস্কর পরখ করে দেখল। তীর্থ ঠিকই বলেছে। চোখাচোখি হতেই ভাস্কর দেখল, তীর্থর মুখে আবার সেই হাসি। অনেকটা অবজ্ঞা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মতো হাসি।

সুহেল, প্রবাল ও সপ্তর্ষি, ওরা তিনজনই খেপে উঠল। চোখ রাঙিয়ে তীর্থকে ধমকাবার চেষ্টা করল। তীর্থ থোড়াই কেয়ার। হাসতে-হাসতে চোখে জল বেরিয়ে এল, তবু হাসি থামে না তার। এবার টুক করে ভাস্করের হাত থেকে রিমোটটা কেড়ে নিল। টিভিটা একবার বন্ধ করছে, একবার চালাচ্ছে।

"আঃ। তীর্থ বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু!" ভাস্করের কথায় শ্লেষ প্রকাশ পেল।

"আমি তো বাড়াবাড়ি করতেই এসেছি।"

"তার মানে?" ভুরু কুঁচকে ভাস্কর জিজ্ঞেস করল।

"মানে? এই দ্যাখ।" তীর্থ দ্রুত ছুটে গিয়ে ঘরের আলো-পাখা নিভিয়ে দিল। তারপর আবার জ্বেলে দিল।

ঘরের ভিতরে তীর্থর উপস্থিতিটা ক্রমশ বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাগে প্রবালের মুখটা লাল হয়ে গিয়েছে। সহ্য করতে না পেরে সে বলেই বসল, "ভাস্কর, তীর্থ আমাদের সঙ্গে বিট্রে করছে। ওকে এখনই আমাদের বয়কট করা উচিত।"

তীর্থ 'ইয়াক' করে একবার লাফিয়ে উঠল। তারপর তেড়ে গেল প্রবালের দিকে। চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে উঠল, "কী বললি, বয়কট?"

ওর হাবভাব দেখে প্রবাল ভয়ে পিছিয়ে গেল। ভাস্কর কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলল, "তুই অমন উত্তেজিত হচ্ছিস কেন তীর্থ? একটু শান্ত হ'।"

তীর্থ তখন ভয়ংকর ক্রোধে ফোঁসফোঁস করে বলল, "কেন? শান্ত হব কেন? তোরা ডেকে এনে আমায় বয়কট করলি! এখন শান্ত হতে বলছিস? যা যা, তোদের সঙ্গে আর কথা নেই। এই চললাম আমি।" বলতে-বলতে তীর্থ দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

ওরাও ছুটল তীর্থর পিছন-পিছন। কিন্তু তীর্থর নাগাল পেল না। অন্ধকারের মধ্যে তীর্থ হারিয়ে গেল নিমেষেই। ওরা চেঁচিয়ে উঠল, "তীর্থ, তীর্থ।"

ভাস্করের মুখটা শুকিয়ে গিয়েছে। সে বলল, "কোথায় গেল বল তো তীর্থটা?" চুপ করে দু' দণ্ড কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "চল। আমরা ওকে খুঁজে বের করি।"

ভাস্করের পিছুপিছু ওরাও বেরিয়ে পড়ল। ভাল করে বাগানটা খুঁজে দেখল। না, এখানে তো নেই। খানিকক্ষণ এধার-ওধার ঢুঁড়ে না পেয়ে ওরা ঘরে ঢুকে পড়ল। ভাস্কর বলল, "ঠিক আছে। আজ থাক। কাল দেখা যাবে।"

রাত তখন একটা। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে ওরা। কিন্তু কারও চোখে ঘুম নেই। ভাস্কর ছটফট করছে। মাথার মধ্যে দপদপ করছে। চিনচিন করে একটা ব্যথা সারা শরীরে ঘোরাফেরা করছে। তারপর কে যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, কে জানে!

সাতসকালে ঘুম ভাঙল মোবাইলের রিংটোনে। পরপর তিনটে মেসেজ হিট করল ভাস্করের সেলফোনে। ভাস্কর ভাবল, এত সকালে কে এস এম এস পাঠাল! হাত বাড়িয়ে মোবাইলটা সে তুলে নিল। এ কী! তিনটে মেসেজই দেখছি একই নাম্বারের। এটা কার নাম্বার? ভাস্করের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। কোনও কিনারা করতে না পেরে এস এম এস-টাকে ক্লিক করে দিল। ইংরেজি হরফে বাংলায় লেখা—

"তোরা এখন কোথায়? ফিরে আয়।
তীর্থ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে।
প্রতুল।"

এস এম এসটা পড়েই ভাস্কর কেমন যেন থমকে গেল। কী মনে হল, আর-একবার পড়ল। তিনটে এস এম এসই এক। প্রতুলেরই পাঠানো।

প্রবাল হঠাৎ মোবাইলটা ছিনিয়ে নিল ভাস্করের হাত থেকে। তারপর ওর হাত থেকে সুহেল, সপ্তর্ষি। সকলেই একেবারে হতবাক! বিস্ময়ে ওদের চোখগুলো স্থির হয়ে রইল মোবাইলের পরদায়। অস্ফুট স্বরে প্রবাল একবার বলল, "এও কি সম্ভব?"

ছবি: বিজন কর্মকার



কুইজ়

বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন শহরকে নানা নামে ডাকা হয়। সেই সব শহরের নিকনেম নিয়ে এবারের কুইজ়।

১ ‘পৃথিবীর বিনোদন রাজধানী’ বলা হয় কোন শহরকে?

২ কোন শহরকে ‘বিশ্বের ফ্যাশন রাজধানী’ নামে ডাকা হয়?

৩ ইতালির এই শহরকে ডাকা হয় ‘পিৎজ়ার শহর’ নামে। এটি কোন শহর?

৪ নেদারল্যান্ডসের অ্যালসমিয়ার শহরকে যদি ‘বিশ্বের ফুলের রাজধানী’ নামে ডাকা ডাকা হয়, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন শহর ‘গোলাপের শহর’ নামে পরিচিত?

৫ কোন শহরকে ‘দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড’ বা ‘পৃথিবীর শেষ প্রান্ত’ নামে ডাকা হয়?

৬ নেপালের কোন শহরকে ‘মাউন্ট এভারেস্টের দ্বারপ্রান্ত’ বলে অভিহিত করা হয়?

৭ ‘গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া’ যদি মুম্বই হয়, তা হলে কোন শহরের নিকনেম ‘গেটওয়ে টু ইউরোপ’?

৮ ‘সোনার শহর’ এবং ‘আফ্রিকার নিউইয়র্ক’ নামে কোন শহর পরিচিত?

অভিজিৎ সুকুল ও তনুশঙ্কর চক্রবর্তী



গত সংখ্যার উত্তর

১. লীলা মজুমদার।
২. স্লোভেনিয়া।
৩. স্কাউটিং মুভমেন্ট।
৪. ইউসুফ ও ইরফান পাঠান।
৫. শিল্পা শেঠি।
৬. ডঃ রাজেন্দ্রকুমার পচৌরি।
৭ ইংল্যান্ড।
৮. লিউইস।

জবাব চাই

১. ‘বাগানের শহর’ এবং ‘সিলিকন ভ্যালি’ নামে ভারতের কোন শহরকে ডাকা হয়?

২. আমাদের দেশের কোন শহরকে ‘ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী’, ‘ভারতীয় ফুটবলের রাজধানী’ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়?

৩. ‘নিজ়ামদের শহর’, ‘মুক্তোর শহর’, ‘নবাবদের শহর’ — ভারতের কোন শহর?

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার জবাব চাই-এর উত্তর

১. প্রতিভা পাতিল। ২. পাকিস্তান। ৩. শাহরুখ খান।

সঠিক উত্তরদাতা

উৎসব দে, ষষ্ঠ শ্রেণি, মালবাজার সিজ়ার স্কুল, জলপাইগুড়ি; **সমাদৃতা মাইতি**, ষষ্ঠ শ্রেণি কলাগাছিয়া জগদীশ বিদ্যাপীঠ; **রাজর্ষি রায়**, সপ্তম শ্রেণি, সোনামুখী বিন্দুবাসিনী জুবিলি হাই স্কুল; **অভিরূপ ভট্টাচার্য**, ষষ্ঠ শ্রেণি, ভাটপাড়া হাই স্কুল; **সুজিত মাহাত, পামির মাহাত, তমোঘ্ন মাজি, সৌরদীপ দাস, সায়ক পর্বত, অনুভব রায়, আদিত্য পণ্ডিত, ময়ূখ বড়ুয়া, সৌরভ সরদার, দেবার্ঘ্য রায় ও সৌভিক ভৌমিক**, ষষ্ঠ শ্রেণি, **সুমিত সরকার, দেবাঞ্জন মাহাত, অনির্বাণ মাহাত, অর্ণব মাজি, অগ্নিভ বাগচি, অরুণাভ আচার্য ও, শৌনাভ ঘোষ**, সপ্তম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ পুরুলিয়া; **নীলাঞ্জন ঘোষ**, ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন, ব্যারাকপুর; **প্রতিভা আগরওয়াল**, শৈলজা মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়; **কুসুম উপাধ্যায়**, অর্জুনপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ; **সৌমেন্দু দাস**, অষ্টম শ্রেণি, সেন্ট লরেন্স হাই স্কুল; **অনীশ দাস**, পঞ্চম শ্রেণি, হুগলি কলেজিয়েট স্কুল; **তন্নিষ্ঠা ভৌমিক**, সপ্তম শ্রেণি, সুশীলকৃষ্ণ শিক্ষায়তন (বালিকা বিভাগ); **রূপঙ্কর সিংহ**, চতুর্থ শ্রেণি, আর্য বিদ্যামন্দির; **আনন্দরূপ চক্রবর্তী, দেবোপম রায় ও মহেন্দ্র**, সপ্তম শ্রেণি, কৃষ্ণপুর আদর্শ বিদ্যামন্দির; **অনির্বাণ চক্রবর্তী**, ষষ্ঠ শ্রেণি, উলুবেড়িয়া হাই স্কুল।



জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
আনন্দমেলা, জবাব চাই,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১।
ই-মেল
anandamela@abpmail.com

অমিল খোঁজো তফাত বোঝো





উপরের এই ছবি দু'টি দেখতে একই রকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। *ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়*

হাসছি দ্যাখো

তাতার কাছে মিষ্টু আবদার করছিল গল্প শোনার। তাতা তাকে গল্প শুনিয়েছিল একটা শর্তে, গল্পের পর মিষ্টুকে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
প্রথম গল্প: এক টুপিওয়ালা তার রংবেরঙের টুপির পসরা নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ হাঁটার পর সে তখন একটা গাছের তলায় পসরা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভেঙে দেখল, তার সমস্ত টুপি মাথায় পরে নিয়ে একদল বাঁদর তাকে ঘিরে রয়েছে। ব্যাপার বুঝে সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল! হঠাৎ তার খেয়াল হল, অন্য বাঁদররাও মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে, অবিকল তার মতো। ব্যাপারটা বুঝতে তার বেশি সময় লাগল না! বাঁদরগুলো তাকে নকল করছে। ধারণা ঠিক কিনা, তা দেখার জন্য সে ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখল এবং বুঝতে পারল সে যা অঙ্গভঙ্গি করছে, বাঁদররাও তাই করছে। তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল! নিজের মাথার টুপিটা সে হঠাৎ করে বাঁদরগুলোর দিকে ছুড়ে দিল। বাঁদররাও নিজেদের টুপিগুলো সব তার দিকে ছুড়ে দিয়ে দিল। টুপিওয়ালা বাঁদরদের কিছু বোঝার সুযোগ না দিয়েই তুলে ফেলল সব ক'টা টুপি। এর পর অনেক বছর কেটে গিয়েছে। সেই টুপিওয়ালার নাতিও টুপির পসরা নিয়ে চলেছে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। দাদুর কাছ থেকে সে পুরো গল্পটাই আগে শুনে নিয়েছিল। অদ্ভুতভাবে তার সঙ্গেও সেই একই ঘটনা ঘটল। কিন্তু দাদুর কথামতো চলা সত্ত্বেও এবার তার ফল হল উলটো। সে কোনও টুপিই ফেরত পেল না। এবার তাতা মিষ্টুকে প্রশ্ন করল, "বাঁদরেরা ওর টুপিগুলো ফেরত দিল না কেন বল তো?"
মিষ্টু অনেক ভেবেও কোনও উত্তর দিতে পারল না। তাতা বলল, "ভুলে যাচ্ছিস কেন, ওদেরও তো দাদু ছিল!"

পুকাইকে গল্প শোনাচ্ছে বিল্টু। বনোয়ারিলালের ধারণা, সে খুব বড় শিকারি। কিন্তু কেউ তার কথায় বিশ্বাস করতে চায় না। একদিন সে ঠিক করল, এবার সকলকে দেখাতেই হবে! বাঘ শিকারের উদ্দেশ্যে একটি জিপ ও বন্দুক নিয়ে একদিন বনোয়ারিলাল জঙ্গলে চলে গেল। কিন্তু সে জঙ্গলে ঢোকামাত্রই একটি বাঘ তাড়া করল তাকে। বিনা প্রস্তুতিতে বাঘের আক্রমণ, ফলে সে খুব ঘাবড়ে গেল। তাড়াতাড়ি জিপ নিয়ে পালাতে গিয়ে দেখল, সামনের রাস্তাটা দু' দিকে ভাগ হয়ে গিয়েছে। বনোয়ারিলাল বুদ্ধি করে জিপের ইন্ডিকেটরটা ডান দিকে করে দিয়ে নিজে বাঁ দিকে ঘুরে গেল। বাঘটা চলে গেল ওই ইন্ডিকেটর বরাবর। বনোয়ারিলাল দেখল, রাস্তা দু'টো ঘুরে একই জায়গায় মিশেছে এবং দূর থেকে বাঘটা তার দিকে ছুটে আসছে। কিন্তু এতই দুর্ভাগ্য যে, এবারে রাস্তাটা নাক বরাবর সোজা চলে গিয়েছে। সুতরাং আগের উপায়ে আর কাজ হবে না। তখন সে আস্তে করে জিপ থেকে নেমে পড়ল এবং রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে তার দিকে তেড়ে আসা বাঘটাকে সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিল। বাঘটাও বেমালুম তার দেখানো পথে চলে গেল এবং বনোয়ারিলাল বেঁচে গেল সে যাত্রা!
পুকাই জিজ্ঞেস করল, " কেন বাঘটা এরকম করল?"
বিল্টু বলল, "আরে, ওই বাঘটা ছিল জঙ্গলের সবচেয়ে বোকা বাঘ!"

অর্থ শেখো

নীচের শব্দগুলো সবই এ-কার দিয়ে শুরু। শব্দগুলো তোমাদের অজ্ঞাত নয়।। তবে তাদের অর্থ সবসময় আমাদের ঠিকঠাক জানা থাকে না। নীচের প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তার পাশে দাগ দেবে। তারপর উত্তরের সঙ্গে মেলাবে।

একদম: (১) একদিকে, (২) একপেশে, (৩) একপক্ষ, (৪) একেবারেই।

একান্ত: (১) একলা, (২) অত্যন্ত, (৩) একঘরে, (৪) একলসেঁড়ে।

এরণ্ড: (১) গাব গাছ, (২) শিশু গাছ, (৩) হিজল গাছ, (৪) ভেরেন্ডা গাছ।

একান্নবর্তী: (১) বারোয়ারি, (২) সবান্ধব, (৩) যৌথ পরিবার, (৪) ধনী পরিবার।

এলেম: (১) টাকাপয়সা, (২) কেরামতি, (৩) ক্ষমতা, (৪) বিদ্যা।

গত সংখ্যার উত্তর

অলবড্ডে: (২) হাবাগোবা। যেমন, 'ওরা ঐরকম দিদি, বড্ড অলবড্ডে, ওদের কি অত বুদ্ধি আছে!'

মগডাল: (৪) গাছের সবচেয়ে উঁচু ডাল। যেমন, 'সেখানে মগডাল অবধি উঁচু যেন সার্কাসের তাঁবুর ছাদ।'

ভণ্ডুল: (২) পণ্ড। যেমন, 'নাঃ, তোদের নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি। যেটাই না দেখব, সেটাই ভণ্ডুল।'

গেরো: (৪) ফ্যাসাদ। যেমন, 'ভ্যালা গেরো রে বাবা।' সংস্কৃত 'গ্রহ' শব্দ থেকে এসেছে। গ্রহের অমঙ্গলকর ক্রিয়াই হল এর অর্থ।

পরোয়ানা: (৩) লিখিত আদেশপত্র। যেমন, 'এদের নামেই পরোয়ানা বের করেছে, দেখা পেলেই ধরে নিয়ে ফাটকে দেবে।'

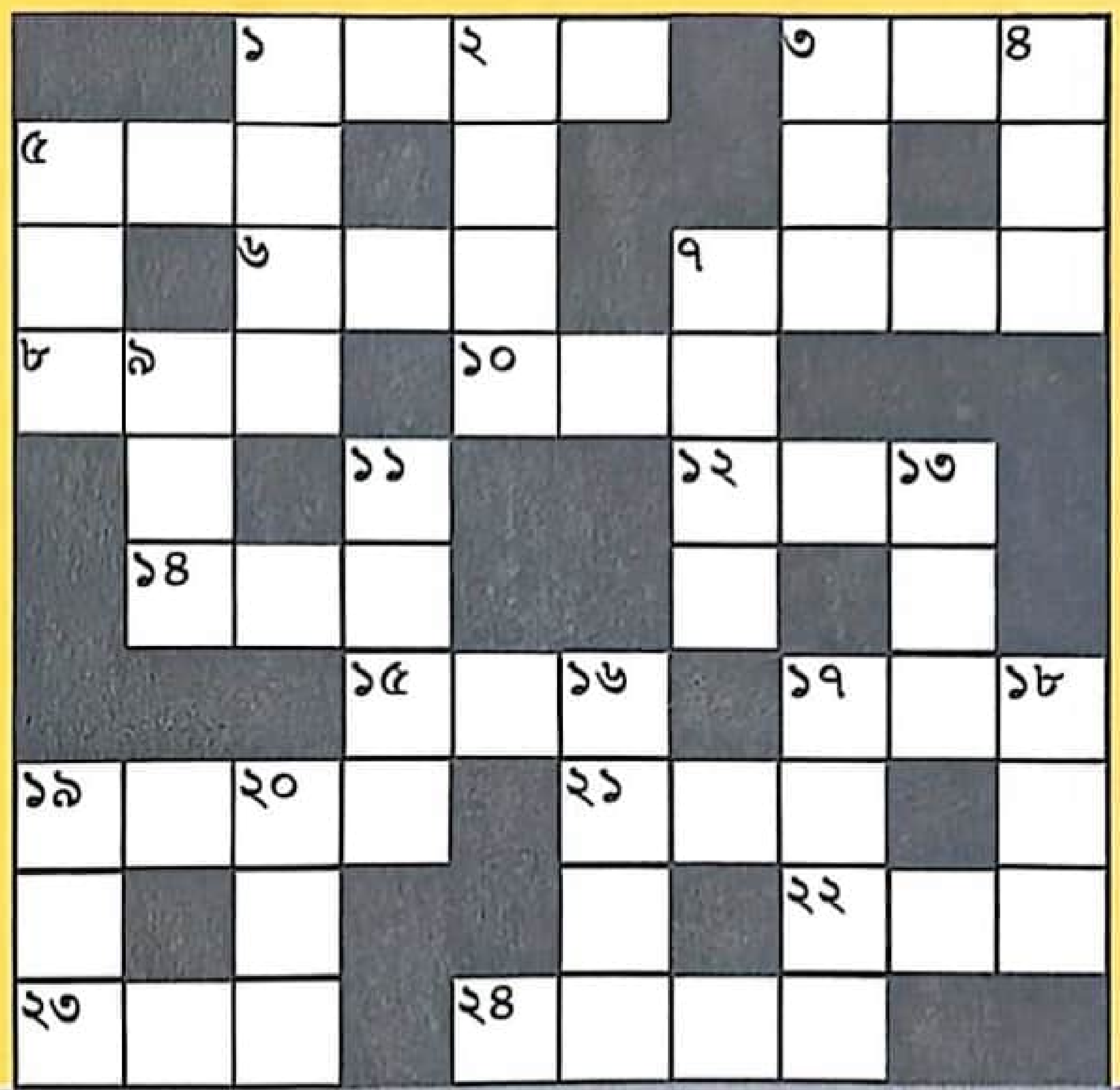
স্কন্দগুপ্ত

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝোর উত্তর

(১) Run Slow কথাটির রং পালটে গিয়েছে। (২) ছেলেটি অন্য দিকে দেখছে। (৩) টুপির কম অংশ দেখা যাচ্ছে। (৪) ছেলেটির প্যান্টের ডান দিকের পকেট নেই। (৫) ছেলেটির গেঞ্জির গলার ডিজাইন আলাদা। (৬) ছেলেটির জুতোর ডিজাইন আলাদা। (৭) পিছনে বাড়ির চিমনি সরে গিয়েছে। (৮) বাড়ির দরজাটা ছোট।

সংকেত: পাশাপাশি

(১) ইন্দ্র। (৩) সহজ নয়, শক্ত। (৫) মাতৃভূমি, নিজের দেশ। (৬) লজ্জাশীল, বলতে ও মিশতে সংকোচ বোধ করে। (৭) সামান্য জলখাবার। (৮) কানাই অর্থাৎ কৃষ্ণের বড় ভাই। (১০) রংযুক্ত, রংমাখা। (১২) রন্ধন, রান্না। (১৪) প্রভৃতি, এইরকম আরও। (১৫) খাদ্য, যা না জুটলে মানুষ অনাহারে মারা যায়। (১৭) লেখকের হাতে থাকে। (১৯) অন্যমনস্ক। (২১) বিরতি, বিশ্রাম। (২২) ' — চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়।' (২৩) উপবীত, সচরাচর ব্রাহ্মণের কণ্ঠে যে যজ্ঞসূত্র দেখা যায়। (২৪) সর্বদা।



সংকেত: উপর-নীচ

(১) মাথায় বারুদ দেওয়া আগুন জ্বালাবার কাঠি ও তার আধার। (২) রাজস্ব, সরকারকে দেয় খাজনা। (৩) পদ্মফুল। (৪) চক্ষু। (৫) নিজের প্রকৃতি, চরিত্র, আচরণ। (৭) লোকের মুখে-মুখে প্রচারিত কথা, গুজব। (৯) ঘুড়ির সুতো যাতে জড়ানো থাকে। (১১) মুদির দোকান, যেখানে চাল-ডাল-তেল ইত্যাদি বিক্রি হয়। (১৩) মজবুত, তীক্ষ্ণ ঠোঁট এবং নখযুক্ত শিকারি পাখিবিশেষ। (১৬) সূর্যরশ্মি বা আলো। (১৭) অল্পের উপর, একটুআধটু। (১৮) দখিনা বাতাস। (১৯) রোদ, — চাউল। (২০) স্নেহ, মায়া।

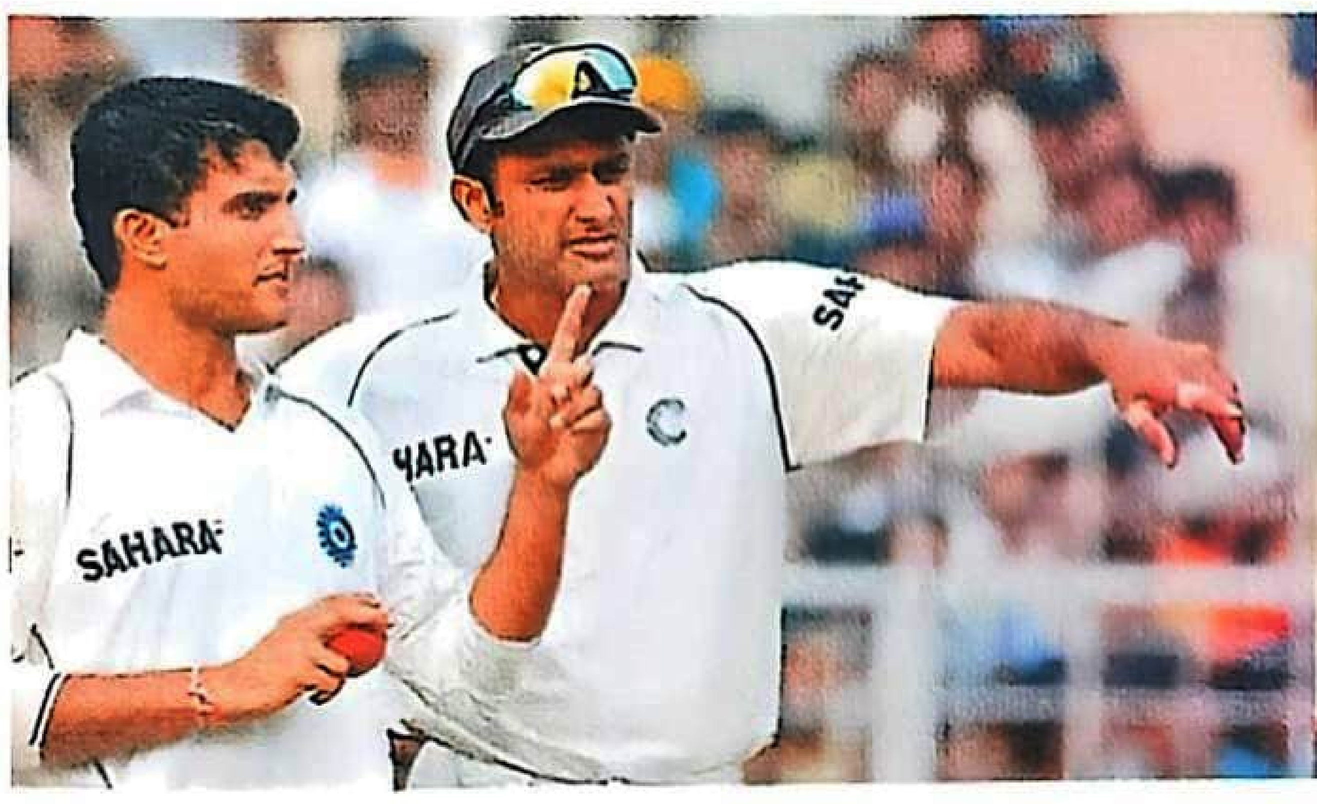
দেবসেনাপতি

গত সংখ্যার সমাধান

অ	ভি	ম	ন্যু		অ	ভি	মা	ন	
বা		ম			নু		না		
ক	র	তা	ল		মা		ন	ধ	র
	ণ		শ	য়	ন		স		সু
	ভূ		ক			হ	ই	চ	ই
জ	মি	দা	র			র		ম	
ট		দা		ক	য়ে	দ		চ	
লা	গা	ম		ল		ম	ন	ম	রা
		শা		তা			বা		ব
	ম	য়	দা	ন		আ	ব	র	ণ

gu ড লে ং থ

ক্রিকেটের সফল 'পরীক্ষার্থী'







আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে সৌরভ যদি কম রানে আটকে যান, আবারও তাঁকে 'অ্যাডমিশন টেস্ট'-এ বসতে হবে। তিনি এই হার্ডলও টপকাবেন। লিখেছেন অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়

পনেরো বছর আগে

দলীপ ট্রোফিতে পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত ১২১ রান, জায়গা হয়ে গেল ১৯৯১-৯২ মরশুমের অস্ট্রেলিয়া সফরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে প্রথম সুযোগ এবং মাত্র তিন রানেই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান পেস বোলার কামিন্সের বলে লেগ বিফোর দ্য উইকেট হয়ে প্যাভিলিয়নে! না, আর একটি ম্যাচেও নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাননি তিনি। জায়গা পেলেন না ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপ দল নির্বাচন থেকে।

তিন বছর আগে

২০০৫ সাল, জিম্বাবোয়ের মতো দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ধীরগতির এক শতরান এবং কয়েকটা টুর্নামেন্টে ধারাবাহিকভাবে খারাপ পারফরম্যান্স তাঁকে রাতারাতি নামিয়ে আনে ফুটপাতে। প্রথমে চোট-আঘাতের জন্য সরানো হয় তাঁকে এবং দু'টো সিরিজের জন্য অধিনায়ক নির্বাচিত হন রাহুল দ্রাবিড়। সিরিজ শেষে খোয়ান অধিনায়কের পদ!

এতক্ষণে নিশ্চয়ই জলের মতো পরিষ্কার, ব্যক্তিটির নাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। হ্যাঁ, পনেরো বছর আগের ঘটনা এবং তিন বছর আগের ঘটনার মধ্যে স্থান-কাল আলাদা হলেও, বোর্ডের কর্তাব্যক্তিদের সৌরভকে বাদ দেওয়ার যুক্তিতে কিন্তু মিল রয়েছে, 'অ্যাটিটিউড সমস্যা'! হ্যাঁ, লর্ডসে ন্যাটওয়েস্ট ট্রোফি জিতে খালি গায়ে জামা ঘোরানো বা স্টিভ ওয়র সঙ্গে বাকযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘটনা হয়তো ভারতীয় ক্রিকেটে বিরল। কেউ স্বীকার করুক আর না-ই করুক, এটা সত্যি যে, সৌরভই ভারতের প্রথম অধিনায়ক, যাঁর ব্যাট-বল-মুখ-মাথা সমান চলত। সৌরভকেই কেন বারবার 'গিনিপিগ' করা হয়? ১৯৯২ সালের পর থেকে আজ ২০০৮ সাল, এই এত বছরের মধ্যে দীপ দাশগুপ্ত, নিখিল হলদিপুর, লক্ষ্মীরতন শুক্ল, দেবাং গাঁধী, সাবা করিমদের মতো বাংলার কয়েকজন ক্রিকেটারকে ভারতীয় দলের জার্সি পরে মাঠে নামতে দেখলেও, মোটেই তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রণদেব বসু, মনোজ তিওয়ারির মতো হোম ক্রিকেটে চূড়ান্ত সফল ক্রিকেটারদেরও হঠাৎ করে দলে নেওয়া হয়েছে যেমন, আবার ঘটা করে বাদও দেওয়া হয়েছে কিছুদিন পর। আর সৌরভ? অধিনায়কত্ব এবং জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ে ইডেনে সকাল-বিকেল প্র্যাকটিস করেছেন এবং ট্রেনারকে বলে রেখেছিলেন, "হাঁফিয়ে গিয়েছি দেখলে কানের কাছে এসে বলবি, দাদা, তোমাকে ইন্ডিয়া খেলতে হবে না? কামব্যাক করতে হবে না?"



'কামব্যাক' শব্দটির অন্য মানে গড়লেন সৌরভ! একের পর-এক একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে রান করেই তিনি ক্লান্ত হলেন না, টেস্টেও সমানতালে রান করে প্রমাণ করলেন যে, তিনি আলাদা। টোয়েন্টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তরুণদের জয়জয়কারের মধ্যে আবার প্রশ্ন উঠে আসে যে, সচিন-সৌরভ-রাহুলদের আর দরকার আছে কি ভারতীয় দলে? ইতিহাসের নিয়ম মেনে আবার 'যূপকাষ্ঠ'-এ চাপানো হয় মহারাজকে। মহড়া শুরু হয় ফের কামব্যাকের এবং চ্যাপেল জমানার নায়ক রাহুল দ্রাবিড়কে রাতারাতি খলনায়ক বানিয়ে সৌরভের গায়ে শুধু 'টেস্ট প্লেয়ারের' তকমা সেঁটে দেয় ভারতীয় বোর্ড। মহারাজকে আবার নামতে হয় মাঠে এবং আবার মাঠে তাঁর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় বিপক্ষের ১১জন খেলোয়াড় এবং ভারতীয় বোর্ড। তিনি বেছে নিলেন দেশের মাটিতে ভারত-পাকিস্তান টেস্ট সিরিজ! ইডেনে শতরান করার স্বপ্নও পূরণ করে ফেললেন তিনি! বেঙ্গালুরু টেস্টে তো ডবল সেঞ্চুরিও করলেন, জিতলেন ম্যাচের এবং সিরিজের সেরার পুরস্কার।

একজন ক্রিকেটারের কাছে প্রত্যেকটি ম্যাচই পরীক্ষা। সঙ্গে 'লেটার মার্কস'টাও পকেটে পুরতে হয়। এখন লেটার মার্কস নয়, সৌরভকে 'স্ট্যান্ড'ও করতে হয় পরীক্ষায়! কিন্তু সৌরভের ক্রিকেট জীবনেই কেন পরীক্ষার ভারটা বেশি হবে? আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনি যদি আবার ৩০ বা ৪০ রানে আটকে যান, তাঁকে 'অ্যাডমিশন টেস্ট'-এ বসতে হবে এবং আমাদের বিশ্বাস যে, তিনি এই হার্ডল টপকাবেন! গোটা ক্রিকেট বিশ্বে তিনিই এক সফল 'পরীক্ষার্থী'!

নিজেকে আইকন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে কার্তিকেয়নের একমাত্র ভরসা নিজেরই সাফল্য। লিখেছেন শুভম ঘোষ



গো কার্তিকেয়ন গো !

ফর্মুলা ওয়ান

সানিয়া মির্জা আর নারায়ণ কার্তিকেয়ন, এঁদের মধ্যে একটা মিল আছে। হ্যাঁ, দু'জনেই খেলোয়াড়। কিন্তু তার বাইরেও অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে। এঁরা দু'জনেই দেখিয়েছেন, একশো কোটিরও বেশি মানুষের ক্রিকেটহুজুগের দেশে, টেনিস খেলে কিংবা গাড়ি ছুটিয়ে কী করে নিজের জায়গা তৈরি করতে হয়।

সানিয়ার খেলার তো তাও একটা ঐতিহ্য রয়েছে, কিন্তু কার্তিকেয়ন? ভারতের খেলাধুলোর জগতে তাঁর নাম পরিচিত হলেও মিডিয়া হাইপ তিনি সেরকম পান না। কিন্তু তিরিশ বছরের এই তামিল যুবক জানেন যে, তাঁর এই স্বল্প-পরিচিতি তাঁর সবচেয়ে বড় সুযোগও। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে কার্তিকেয়নের একমাত্র ভরসা নিজের সাফল্য। এবং সেটাই তিনি করে চলেছেন।

সম্প্রতি চিনে ঝুহাই ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটে কার্তিকেয়ন সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে টিম ইন্ডিয়াকে প্রথমবারের জন্য এ-ওয়ান জিপি (এ-ওয়ান গ্রাঁ প্রি) চ্যাম্পিয়ন করলেন। গ্রিডে তৃতীয় পজিশন থেকে কার্তিকেয়ন নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়েন লক্ষ্যভেদ করতে এবং প্রত্যেক ল্যাপে তিনি তাঁর পারফরম্যান্সের মান তুলতে থাকেন। বিশেষ করে তাঁর ফর্মুলা ওয়ান রেসিং-এর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি যেভাবে অন্তিম লগ্নে নিউজিল্যান্ডের জনি রিডকে টেক্কা দেন, তাতে চোখ বুজে বলা যায় যে, এই 'দলগত' জয়ের আসল কারিগর কার্তিকেয়নই। কার্তিকেয়নের এই পারফরম্যান্স আরও দেখাল, টিম উইলিয়াম্স-এর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হওয়ার পর এবং বিজয় মাল্যর ফোর্স ইন্ডিয়া দলে জায়গা না পেলেও তিনি আত্মবিশ্বাস হারাননি। বরং আশার বাণী শুনিয়েছেন, "আমি খুব শিগগিরই এফ-ওয়ান রেসিংয়ে ফিরব"।

কার্তিকেয়ন ছোট থেকেই রেসিং কার-এর ভক্ত। দেশের প্রথম ফর্মুলা ওয়ান রেসিং ড্রাইভার হিসেবে স্বীকৃতি পেতে তিনি দেশে-বিদেশে একের পর-এক ধাপ পেরোতে থাকেন। ১৯৯৮ সালে কার্লিন মোটরস্পোর্টসের হয়ে ব্রিটিশ ফর্মুলা থ্রি চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর অভিষেক ঘটে। ২০০১ সালে কার্তিকেয়ন প্রথম এফ-ওয়ান রেসিংকার চালানোর সুযোগ পান। জাগুয়ার রেসিং দলে তাঁর চোখে পড়ার মতো টেস্টিং পারফরম্যান্স জর্ডান-হন্ডা ই জে একাদশ দলেও তাঁকে টেস্টিংয়ের সুযোগ করে দেয়। ২০০৪-এ তিনি মিনার্ডি দলের হয়ে ফর্মুলা ওয়ান টেস্ট ড্রাইভের চান্স পান। কিন্তু প্রয়োজনীয় স্পনসরশিপের অভাবে আটকে যান। ২০০৬ সালে তিনি উইলিয়াম্স দলে অন্তর্ভুক্ত হন। কার্তিকেয়নের এই উত্তরোত্তর উত্থানে চমকের অভাব নেই। বিশেষ করে, তিনি যেখান থেকে উঠে এসেছেন, যেখানে এখনও এফ-ওয়ান সংস্কৃতিই গড়ে ওঠেনি সেভাবে। তবে তাই বলে কার্তিকেয়ন বসে নেই। কিমি রাইকোনেন, ফার্নান্দো অ্যালোনসোদের সঙ্গে তিনি ক্রমাগত টক্কর দিয়ে চলেছেন এবং দেশের মানুষের সামনে নিজেকে এক নতুন আইকন হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। ভারতের নতুন প্রজন্মও তাঁকে দেখে মেতেছে কার র‍্যালি বা গো-কার্টিং নিয়ে। এটাই তো আশার কথা!



আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন মুরলীর

বোলিং অ্যাকশন নিয়ে সব অভিযোগকে 'দুসরা'য় ধরাশায়ী করে টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ উইকেটের নজির গড়লেন শ্রীলঙ্কার মুথাইয়া মুরলীধরন! লিখেছেন **শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**





মেলবোর্ন টেস্ট, ১৯৯৫ সাল। বল করছেন মাত্র ২৩ বছর বয়সি একটি ছেলে। তাঁর স্পিনের চমকে খেলোয়াড়দের বেশ নাজেহাল অবস্থা। হঠাৎই ছবিটা কীরকম বদলে গেল। আম্পায়ার একের পর-এক 'নো বল' ডাকতে লাগলেন! সেদিনের গোটা ইনিংসে সাতবার! এত 'নো বল' কেন? তবে কি বারেবারে 'পপিং ক্রিজ়' বা সাদা দাগের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে বোলারের পা? না, তেমন কিছু নয়। আম্পায়ার ডারেল হেয়ার অভিযোগ করলেন, এই খেলোয়াড় নিয়ম মেনে বল করছেন না। তিনি বল ছুড়ে মারছেন! ২৩ বছরের সেই বোলারের নাম মুথাইয়া মুরলীধরন। এখন তাঁর বয়স ৩৫। মুথাইয়া মুরলীধরন তো ডারেল হেয়ারের অভিযোগ শুনে অবাক। তিনি যে বল ছুড়ে মারেন না, সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। এখন অবশ্য এই নিয়ে কারওরই কোনও সন্দেহ নেই। ক্রিকেটের যে রুলবুক বা নিয়মাবলি তৈরি হয়েছিল, তার ২৪ নম্বর আইনে অবশ্য বলা আছে, বল হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কনুই বা কবজি, কোনওটাই সোজা করা যাবে না। এটা না মানলেই 'নো বল'! কিন্তু মুরলীর বল করার মধ্যে কোনও গন্ডগোল নেই। ১৯৯৫-এ ডারেল হেয়ারের সিদ্ধান্তে ক্রিকেটমহল তো বটেই, খুবই রেগে গিয়েছিলেন স্বয়ং ডন ব্রাডম্যানও। তিনি বলেছিলেন, এটা তাঁর কাছে 'worst example of umpiring'! এখানেই অবশ্য মুক্তি পাননি মুরলী। ১৯৯৮-৯৯ মরশুমেও তাঁর বল করার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আর-এক আম্পায়ার রস এমারসন।

আবার নতুন করে শুরু হল মুরলীর কঠিন পরীক্ষা। সামনে প্রতিপক্ষ নেই, উইকেট নেই, তবু নিরলস তাঁকে বল করে যেতে হচ্ছে! কেন? 'হাই টেক' পরীক্ষায় দেখা হচ্ছে, তিনি সত্যিই ছুড়ে বল করেন কিনা। অবশেষে আইসিসি সিদ্ধান্তে আসে, মুরলীধরন মোটেই ছুড়ে বল করেন না।

মুরলীধরন অনেক ভিত্তিহীন অভিযোগের শিকার হয়েছেন বটে, কিন্তু এতে তিনি ভেঙে পড়েননি এতটুকুও। একের পর-এক ছিটকে দিয়েছেন স্টাম্প। ব্যাটসম্যানদের অবাক করে দিয়েছেন চোখ-ধাঁধানো অফ স্পিন আর 'দুসরা'য়। এরই সঙ্গে গড়েছেন রেকর্ড। টেস্ট ক্রিকেটে শেন ওয়ার্ন, কুম্বলে, ম্যাকগ্রা, কোর্টনি ওয়ালশ, সক্কলকে পিছনে ফেলে সবচেয়ে বেশি উইকেট তুলে নিলেন মুরলীধরন। তাঁর ঝুলিতে এখন ৭১৯ উইকেট (এই লেখা পর্যন্ত)! দ্বিতীয় স্থানেই আছেন শেন ওয়ার্ন। কিন্তু একটা চমক আছে এখানেও। ওয়ার্ন টেস্ট খেলেছেন ১৪৫টি। কিন্তু মুরলীধরনের টেস্ট-সংখ্যা ১১৮! প্রতিটি টেস্টে গড়ে অন্তত ছ'টা উইকেট নিয়েছেন তিনি। এখানেই মুরলীধরনের জাদু।

বিতর্ক-ঝড় তাঁকে কাবু করেছে অনেকবার, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি কখনওই। শ্রীলঙ্কার এক গরিব পরিবারের ছেলে আজ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। স্টিভ ওয়র মতে তিনি 'বোলিংয়ের ব্রাডম্যান'! মুরলী তাঁর 'মাছের চোখ' থেকে কখনওই দৃষ্টি ফেরাননি। এবং সেটা আর কিছুই নয়, আরও বেশি উইকেটের খিদে। তাই ২০০২ সালে 'উইজ়ডেন' পত্রিকা তাঁকে 'দ্য বেস্ট বোলার অফ অল টাইম' হিসেবে চিহ্নিত করে। মজার ব্যাপার, এই ঘটনার মাত্র বছর দুয়েক আগেই যখন সেরা পাঁচ 'উইজ়ডেন ক্রিকেটার্স অফ দ্য সেঞ্চুরি'-র তালিকা তৈরি করা হচ্ছিল, মুরলীধরনের নামটিও সেখানে উল্লেখ করা হয়নি! কিন্তু আজ আর পিছন ফিরে তাকানোর প্রয়োজন নেই তাঁর। তাঁর চোখ এখন সামনের দিকে, তাঁর লক্ষ্য আরও বেশি উইকেট, আরও ভাল ক্রিকেট!

বোলিংয়ে তো তাঁর জবাব নেই বটেই, খেলার জগতের বাইরেও মুরলীধরনের পরিচয় একজন উপকারী মানুষ হিসেবে। তিনি 'দ্য ফাউন্ডেশন অফ গুডনেস' নামে একটি চ্যারিটি অর্গানাইজ়েশনের সঙ্গে যুক্ত। ২০০৪ সালের ভয়ংকর সুনামি-পীড়িত মানুষদের তিনি সাহায্য করেছেন মুক্তহস্তে। তিনি নিজেই বেঁচে গিয়েছিলেন অল্পের জন্য!

এভাবেই এগিয়ে যাবেন মুথাইয়া মুরলীধরন। আমাদের আশা, একদিন তাঁর নামের পাশে লেখা থাকবে — 'টেস্ট ক্রিকেটে ১,০০০ উইকেট'!



লক্ষ্য এবার অলিম্পিক

ভারতের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের তালিকায় নিজের জায়গা করে নিলেন দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়।

লিখেছেন **জয় সেনগুপ্ত**

তিরন্দাজ আর লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে রয়েছে সুইমিং পুল। জলের উপর দিয়েই তির ছুড়তে হচ্ছিল প্রতিযোগীদের। তা দেখে মেয়েটির জেদ বেড়ে গেল আরও। সঠিক নিশানায় লক্ষ্য ভেদ করার আত্মবিশ্বাস, আর লড়াকু মানসিকতা সম্বল করে প্রস্তুত হলেন তিনি। ঠিক এই সময় প্রচণ্ড চাপের মুখে টিকে থাকার দুর্লভ গুণ যাঁর নেই, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা তাঁর পক্ষে খুবই শক্ত। আর মেয়েটি তো এই প্রথম জলের উপর দিয়ে তির ছুড়তে চলেছেন! গোটা শুটিংরেঞ্জ জুড়ে নৈঃশব্দ্য। দর্শকরা নিশ্চুপ। টানটান উত্তেজনার মধ্যে শেষ হতে লাগল একের পর-এক রাউন্ড। এক সময় নিজের সেরা পারফরম্যান্স দেখিয়ে মেয়েদের রিকার্ভ বিভাগে সাউথ কোরিয়ার চই ইয়ুন ইয়ং-কে এক পয়েন্টে (১১০-১০৯) হারিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর মাথায় উঠল চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নস-এর মুকুট। মেয়েটি জিতে নিলেন সোনার মেডেল, সেই সঙ্গে পেলেন ১০,০০০ ডলার পুরস্কার। এর আগে ইংল্যান্ডের ডোভারে ফোর্থ লেগ-এ চিনের জুয়ান জুয়ান ঝাং-কে হারিয়ে (১১১-১১০) বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন সাতাশ বছরের এই মেয়েটিই।

কে এই বঙ্গতনয়া, যাঁর নাম সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে গেল ভারতীয় তিরন্দাজির ইতিহাসে? দুবাইয়ে মেয়েদের বিশ্ব তিরন্দাজির চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নস হয়ে এই নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যিনি, তাঁর নাম দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়ার ইস্টার্ন রেলওয়েতে চাকরি করেন। এই তরুণী স্থান পেলেন ভারতীয় ক্রীড়াজগতের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের তালিকায়।

তিরন্দাজিতে বিশ্বজুড়ে হয় মোট চারটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা। যাঁরা চ্যাম্পিয়ন হন, তাঁদের নিয়েই বসে গ্র্যান্ড ফাইনালের আসর। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত এবারের সেই গ্র্যান্ড ফাইনালে দোলার এই পারফরম্যান্স চমকে দিয়েছে সকলকে। সেমিফাইনালে তাঁর কাছে হেরে গিয়েছিলেন রাশিয়ার নাতালিয়া এরদিনিয়েভা।

কলকাতা ছাড়ার দু'দিন আগে তাঁর ভাই রাহুল যখন দেখলেন, দিদির ধনুকে চিড় ধরেছে, কলকাতার বরাহনগরের বসাকবাগানের বাড়িতে সেদিন একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন দোলা। শেষ মুহূর্তে নতুন ধনুক নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না তাঁর। এর পরের ঘটনা তো ইতিহাস।

গ্র্যান্ড ফাইনালের শুরুটা কিন্তু খুব মসৃণ ছিল না। ২০০৭-এর ২৪ নভেম্বর শনিবার ফাইনাল শুরু হতে না-হতেই বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিলেন দোলা। প্রথম রাউন্ডে কোরিয়ার প্রতিযোগী চই-এর চেয়ে পিছিয়ে পড়েছিলেন তিনি। দ্বিতীয় রাউন্ডেও তাঁর পারফরম্যান্স হতাশাজনকই ছিল। এর পর তৃতীয় রাউন্ড। এই রাউন্ডে দোলা পিছিয়ে রইলেন এক পয়েন্টে। যখন শেষ রাউন্ড শুরু হল, অনেক দর্শকই ভেবেছিলেন, দোলা হয়তো এই রাউন্ডেই ছিটকে যাবেন ফাইনাল থেকে। প্রথম তির ছোড়ার পর দোলার আট, আর চইয়ের সাত পয়েন্ট। দ্বিতীয় তির ছোড়ার পর দু'জনেরই পয়েন্ট নয়। এর পর শেষ তির। এই শেষ তিরই মোড় ঘুরিয়ে দিল দোলার তিরন্দাজি কেরিয়ারের। জামসেদপুরের টাটা আর্চারি অ্যাকাডেমির এই তিরন্দাজ পেলেন ন' পয়েন্ট, চইয়ের সংগ্রহে তখন আট।

২০০৮ সালের অগস্টে বেজিং অলিম্পিকে বিশ্বসেরাদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে দোলা কি পারবেন পদক আনতে? দুবাইয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মাত্র চারজন তিরন্দাজ, অলিম্পিকে তাঁকে লড়তে হবে কমপক্ষে বারো-তেরোজন বিশ্বসেরার সঙ্গে। যাতে পাল্লা দিতে পারেন সারা বিশ্বের 'হেভিওয়েট' তিরন্দাজদের সঙ্গে, তাই তাঁকে হয়তো কোরিয়ায় পাঠানো হতে পারে ট্রেনিং নিতে। এই ট্রেনিংয়ের জন্য সামসুং কোম্পানি খরচ করবে প্রায় চার লক্ষ টাকা। আর দোলা? আত্মবিশ্বাসে ভরপুর 'অর্জুন' পুরস্কারজয়ী এই তরুণী এখন থেকেই লক্ষ্য স্থির করছেন মাছের চোখে, তাঁর স্বপ্নের অলিম্পিকের জন্য।



ফি রে দে খা

খেলাধুলোয় ২০০৭ সালটা নতুনত্বের বছর। হারালাম যতটুকু, পেলাম তারও চেয়ে অনেক বেশি। লিখেছেন সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেলে আসা একটি বছর



কাকা

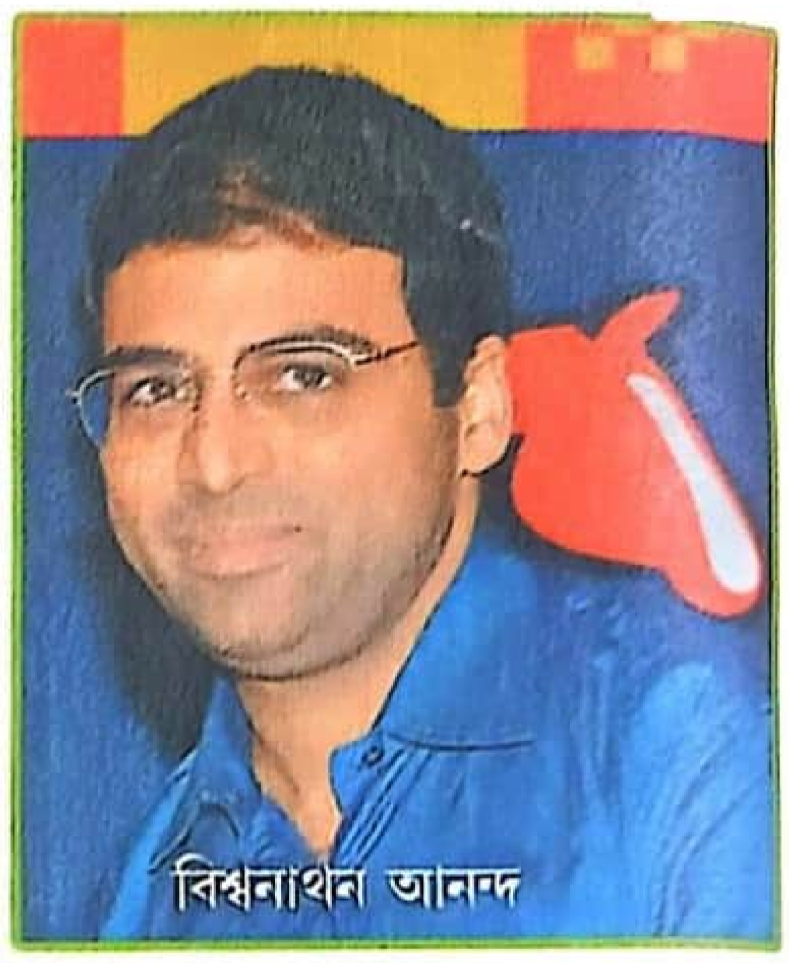
এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে সচিনদের রাজপাট খোয়ানোর আশঙ্কা বছর পাঁচেক আগেও ভাবা যেত না! কিন্তু লিয়েন্ডার, মহেশ, অঞ্জু ববি জর্জ বা ধনরাজ পিল্লেদের কাছে অধরাই ছিল যা, এই প্রজন্মের পঙ্কজ আডবাণী, কৃষ্ণন শশীকিরণ বা সাইনা নেহওয়ালরা অবলীলায় সেই অসাধ্যসাধনই করেছেন।

প্রায় আড়াই দশক পর মাহিদের 'ছোট' বিশ্বকাপ জেতার বছরে সত্যি-সত্যিই শাপমুক্তি। পাকিস্তানকে হারিয়ে টিম ইন্ডিয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে ওয়ান্ডারার্স চক্কর দেওয়ার সেই ছবিই হয়তো মারাত্মক তাতিয়ে দিয়েছিল ভাইচুং, বিশ্বনাথন আনন্দ, দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তা না হলে বছরের শেষ পর্বে অমন উদ্দীপিত লাগবে কেন ওঁদের?

ফুটবলেও 'চক দে...'

বছরটা ওঁদের সগর্ব দম্ভ প্রকাশের। অগস্টে ভাইচুংদের নেহরু কাপ জয়। বাংলাদেশ, তুর্কমেনিস্তান, সিরিয়া নেহরু কাপে যাদের হারিয়ে ট্রোফি নিয়ে ভিক্টরিল্যাপ ভাইচুংদের, তারা কেউই কিন্তু ফিফা বিশ্ব ক্রমতালিকায় সামনের সারির নয়। তবুও নতুন করে শুরু হওয়া নেহরু কাপে জেতার পর অম্বেডকরে ভারতীয় ফুটবলে গুরুত্বপূর্ণ বাঁক এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ভাইচুং, প্রদীপ, মঞ্জু, সুনীল ছেত্রী, অজয়নদের পায়ে! বাংলার সেই দাপট এখন প্রায় নেই। কারণ, বাঙালি ফুটবলাররা নন, দেশের সেরা-সেরা ক্লাব টুর্নামেন্টগুলোয় যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকছেন ভিনদেশের বা ভিনরাজ্যের তারকারাই।

জাতীয় দলেও প্রায় উধাও বাঙালিরা। নেহরু কাপজয়ী স্কোয়াডেও ভাইচুং থেকে রেনেডি সিংহ, ক্ল্যাইম্যাকস লরেন্সদের ভিড়! জাতীয় লিগে ২০০৭ দেখল ডেম্পোর ভিক্টরি পোজ। ইস্টবেঙ্গল তিনে শেষ করলেও মোহনবাগান, মহমেডানের অবস্থা ছিল রীতিমতো সঙ্গীন।



বিশ্বনাথন আনন্দ

বিদেশে তাকালে শুরুতেই টিম ব্রাজিল। জুলাইয়ের কোপা আমেরিকায় নতুন কোচ ফুটবলাররাও অধিকাংশই আনকোরা মুখ। রোনাল্ডো, কাকা, রোনাল্ডিনহো, সেলেকাওদের দুঙ্গা হাতেই পাননি। অ্যালেক্স, দিয়েগো, কোপার তারকা বনে গেলেন শেষমেশ এই তরুণ তুর্কীরাই। ফিফার বর্ষসেরা হলেন কাকা।

কোপায় ছিলেন না, কিন্তু ২০০৭ সত্যিসত্যিই কাকার ফুটবল কেরিয়ারে অন্যমাত্রা জুড়ল। বর্ষসেরার হ্যাটট্রিক, আর তার সঙ্গেই এসি মিলানের জার্সিতে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ। আফসোস ইউরোপের দখলদারি সত্ত্বেও ফেলে আসা বছরটায় এসি মিলানে ঘরোয়া লিগে চূড়ান্ত ব্যর্থতা। ইউরোপের সবচেয়ে জমকালো আরও তিন লিগ ই পি ওল, লা লিগা আর বুন্দেশলিগা। ইংলিশ প্রিমিয়ারশিপে চেলসির দৌড় থামালেন রেড ডেভিলসরা। স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের কোচিংয়ে অষ্টম লিগ খেতাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। এফ এ কাপে অবশ্য চেলসির জয়জয়কার। ম্যান ইউ কে হারিয়ে ট্রোফি দ্রোগবা, ল্যামপার্ড, শেভচেঙ্কোদের। লা লিগায় চার মরশুম পর ফের রিয়াল মাদ্রিদের ভিক্টরি ল্যাপ।



ঝুলন গোস্বামী

পালাবদলের হাওয়া থ্রি লায়নস আর্মিতেও টিম ইংল্যান্ডের সেই বিখ্যাত লোগোয় তিন সিংহ। মাঠে সিংহবিক্রম অবশ্য কোথায়? ইউরো কোয়ালিফায়ার্সে ক্রোয়েশিয়ার কাছে হার আর তার মানে ২০০৮ সালে ইউরো কাপে ওরা



লিউইস হ্যামিলটন

থাকছেই না। নতুন বছরে নতুন কোচের হাতে পড়ে আদৌ ভাগ্য ফেরে কী না ইংল্যান্ডের, এখন সেটাই দেখার।

ধোনিদের বিশ্বজয়

ক্রিকেটের নতুন ফর্ম টোয়েন্টি-টোয়েন্টি। আর ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৭-এর পরে মাহি, যুবি, ভাজ্জি, আর পি'রা গড়পড়তা ক্রিকেটভক্তের ঘরের দেওয়ালে। স্প্রিংবকদের দেশে সচিন, রাহুল, সৌরভ, কুম্বলে, জাহিরদের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও কিন্তু ছোট বিশ্বকাপ জুড়ে মাহি'র টিম ইন্ডিয়া আগাগোড়াই ঝকঝকে। আড়াই দশক পর ক্রিকেটে আবারও বিশ্বখেতাব।

ক্যারিবিয়ার মহাযুদ্ধে ওয়াগার দু' পারেই শোকগাথার জন্ম দিলেন রাহুল-ইনজামামরা। প্রাথমিক পর্বেই শ্রীলঙ্কা আর বাংলাদেশের কাছে জঘন্য হার। গ্রেগ চ্যাপেল জমানার শেষ। রাহুল কিন্তু রইলেন। ২১ বছর পর ইংল্যান্ড থেকে রাবার আনলেন। তিন টেস্টের সিরিজে ৩-০ জিতল টিম ইন্ডিয়া। ও ডি আই'তে অবশ্য অন্য ছবি। সিরিজে ১-৩ পিছিয়ে থেকেও ৩-৩ কিন্তু লর্ডর্সের চূড়ান্ত ম্যাচে হার। এরপর দেশে ফিরেই নাটকীয়ভাবে অধিনায়কত্ব থেকে স্বেচ্ছা অবসর রাহুল দ্রাবিড়ের।



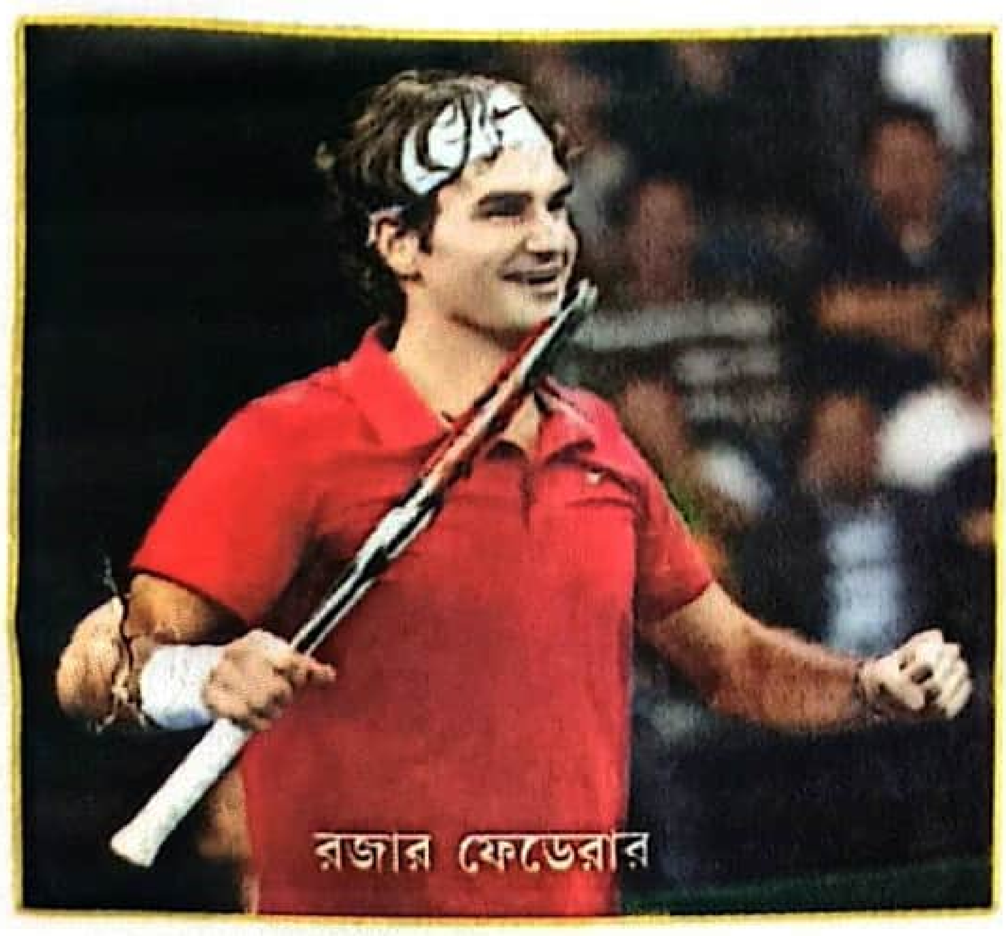
অনিল কুম্বলে

এর পর নতুন অধিনায়ক অনিল কুম্বলের নাম ঘোষণা বিসিসি আই'য়ের। সদ্য শেষ হওয়া বছরটায় টিম ইন্ডিয়াকে আমরা পেলাম তিন অধিনায়কের অধীনে। রাহুলে শুরু, কুম্বলেতে শেষ! নতুন নেতার অভিষেক ঘটল বেশ জম্পেশ ভাবেই। দেশের মাঠে পাকিস্তানকে টেস্ট সিরিজে এবং ওয়ান ডে'তে হারানো আগাগোড়া কর্তৃত্ব রেখেই।

ক্রিকেটের শেষ কথা অস্ট্রেলিয়া, এই গ্রহে এটাই চালু ধারণা। পারফরম্যান্স গ্রাফ আর ধারাবাহিকতাই চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেবে ওদের সঙ্গে অন্যদের ফারাক। বিশ্বকাপে খেতাবজয়ের হ্যাটট্রিক। তবুও বার্বেডোজের কেনসিংটন ওভালে দাঁড়িয়ে সেই এপ্রিল সন্ধ্যায় অদ্ভুত নির্লিপ্ত লেগেছিল গোটা দলটাকেই।

২০০৭ সাল আলাদা করে তোলা থাকবে চাকদহ আর বেহালা-বাংলার দুই শহর আর মফস্সলের ক্রিকেটমননেও! ঝুলন গোস্বামী জো বার্গে গিয়ে ধোনির হাত থেকেই বর্ষসেরা মেয়ে ক্রিকেটারের ট্রোফি নিলেন। আর চ্যাপেল-মোরে'র রোষানলে পড়ে হারিয়ে যেতে বসা বাংলার মহারাজের অন্তর্ভুক্তি। টেস্টে সচিন, রাহুল, লক্ষণদের চেয়েও ২০০৭ সালে সৌরভের রান বেশি। মাত্র ন'টি টেস্টেই হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছেন। যেরকম ফর্মে, তাতে ডাউন আওয়ারেও সৌরভই ভরসা।

এন্যাঁ-ফেডেরার কীর্তি



রজার ফেডেরার

ফেডেরার যুগ। সত্যি-সত্যিই তিন-চার বছর ধরে যেভাবে দাপট দেখাচ্ছেন তাতে দু'-একজন ছাড়া সার্কিটের অন্য সকলকেই হাইফেনের মতোই লাগছে। ২০০৭ সালে সুইস সেনসেশনের নামের পাশে আটটা খেতাব, তিন-তিনটে গ্র্যান্ডস্লাম। বিয়র্ন বর্গের মতো টানা পাঁচবার খেতাব জেতা হয়ে গেল উইম্বলডনে। তবে ফেডেরারের চেয়েও বছরজুড়ে আরও ঝকঝাকে লাগল জাস্টিন এন্যাঁকে। ফরাসি ওপেন, ইউ এস ওপেনে বাজিমাত। এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে দশ-দশটা টুর্নামেন্ট জয়। এক দশক আগে মার্টিনা হিঙ্গিসের বারো খেতাবের রেকর্ড ছোঁয়া গেল না, এন্যাঁর আক্ষেপ এটাই।

কিমি'র কিস্তিমাত

কিস্তিমাত করেই ফেলেছিলেন প্রায়। শেষরক্ষা হল না একটুর জন্য। সার্কিটে পয়লা মরশুম কে বলবে লিউইস হ্যামিলটনকে দেখে? সারা বছরে পাঁচটা গ্রাঁ প্রি জিতলেন। কিমি রাইকোনেন চাপে ফেলে দিয়েছিলেন ফর্মুলা ওয়ানের অন্য মহাতারকাদেরও।

আনন্দ, দোলাদের ভোলা যাবে না

ভোলা যাবে না হকির টিম ইন্ডিয়াকেও। চেন্নাইয়ে এশিয়া কাপের সব ম্যাচেই জোয়াকিম কার্ভালোর ছেলেরা ঝুড়িঝুড়ি গোল করলেন। ফাইনালে শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষেও ৭-৩ জয়। ব্লকবাস্টার ছবির হাতেগরম চিত্রনাট্য নিজেদের স্টিকে তুলে আনলেন দিলীপ তিরকে, প্রভজ্যোৎ সিংহ, যুগরাজ সিংহরা।

টেনিসে সানিয়া মির্জা বছরটা শুরু করেছিলেন অনুজ্জ্বলভাবে। চোট সারিয়ে ফেরার পর মরক্কো ওপেনে বেসামাল তিনি। গুছিয়ে নিতে লাগল বেশ কয়েক মাস। উইম্বলডনের পরে হার্ডকোর্টের টুর্নামেন্টগুলো শুরু হতেই সানিয়া স্বমহিমায়।

২০০৭ সালের শেষ দিকে যে কাণ্ড ঘটালেন বরাহনগরের দোলা, ভারতীয় খেলার ইতিহাসে তা সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মতো। বিশ্বকাপে তিরন্দাজিতে কোরিয় প্রতিযোগীকে হারিয়ে ট্রোফি জেতা অন্য মাত্রা যোগ করল। মেক্সিকো সিটিতে ভিশি আনন্দের বিশ্বখেতাব ছিনিয়ে নেওয়াটাও অনন্য কীর্তি। ইভানচুক, লেকো, ক্রামনিকের মতো চৌষট্টি খোপের তাবড় মহারথীদের পিছনে ফেলে বিশ্বনাথন আনন্দের বিশ্বজয় ২০০৭ সালকে সহজে ভুলতে দেবে না!



মহেন্দ্র সিংহ ধোনি

বিদায় ফুটবল: মালদিনি



এবার থামতে চান মালদিনি। এই প্রথম ইউরোপের কোনও ক্লাব জিতে নিল ক্লাব বিশ্বকাপ। নজির গড়ল ইতালির কিংবদন্তি ফুটবলার পাওলো মালদিনির এসি মিলান। রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, লিভারপুলের মতো ইউরোপের বাঘা-বাঘা ক্লাব চেষ্টা করেও এর আগে এমন কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেনি। ইয়োকোহামায় তারা ৪-২ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্তিনার বোকা জুনিয়র্সকে। স্বপ্ন পূরণের পর মালদিনি ফুটবলকে বিদায় জানানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। ক্লাব বিশ্বকাপ জিতে ৩৯ বছর বয়সি ইতালির লেফ্‌ট ব্যাকটি জানিয়েছেন, "এটাই শেষ মরশুম। তারপর অবসর। ফুটবল জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি। কোনও আক্ষেপ নেই।" ইতালির হয়ে বিশ্বকাপ ও ইউরো কাপে রানার্স হয়েছেন। মিলানে ২৪ বছরের ফুটবল জীবনে 'ইউরোপ সেরা' হয়েছেন পাঁচবার। সিরি এ লিগ জিতেছে সাতবার। আন্তর্জাতিক ফুটবলকে আগেই বিদায় জানিয়েছিলেন। এবার ক্লাব ফুটবলেও আর দেখা যাবে না মালদিনিকে।

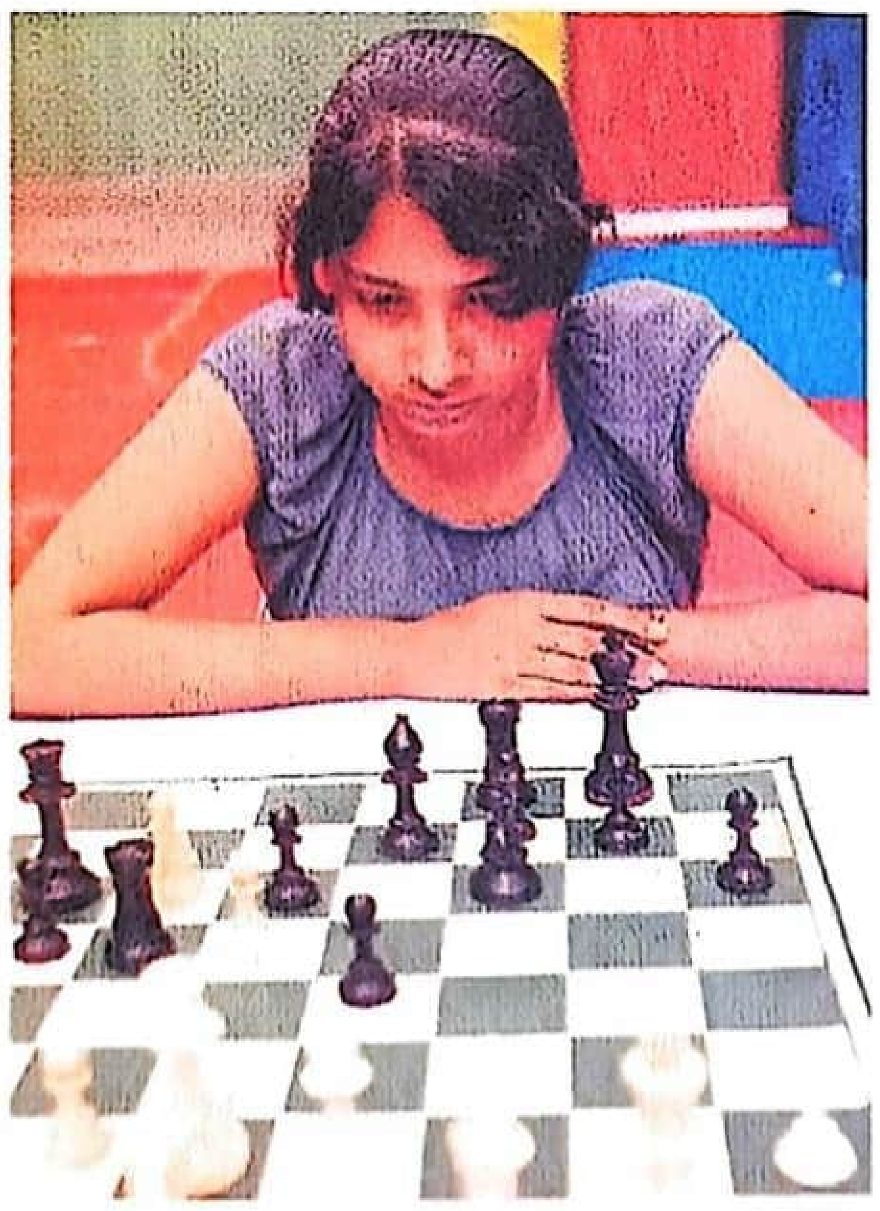
পেলের গোলের ছবি নিয়ে পদক

এবার সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জের তৈরি পদকে পেলের গোলের ছবি দেখা যাবে। ব্রাজিলের টাঁকশালে ওই পদকগুলো তৈরি হবে। সেই পদকে থাকবে কিংবদন্তি ফুটবলার পেলের স্মরণীয় গোলের ছবি। ছবিটি পেলে নিজেই নির্বাচন করে দিয়েছেন। ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপে পেলে ওই গোলটি করেছিলেন। মোট ১,২৮৩টি পদক তৈরি করা হবে। বিশ্বের নানা দেশে ওই পদক নিলাম হবে। সেই নিলাম থেকে পাওয়া অর্থ দক্ষিণ ব্রাজিলের এক শিশু হাসপাতাল নির্মাণে ব্যয় করা হবে। নিলাম চলাকালে হাজির থাকবেন স্বয়ং পেলে।



টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট নিয়ে নতুন ভাবনা

ক্রিকেটকে আরও আকর্ষক করে তুলতে বেশ কিছু অভিনব প্রস্তাব দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন। নতুন নিয়মের এই চটজলদি ক্রিকেটকে কীভাবে আরও জনপ্রিয় করে তোলা যায়, তা নিয়ে সম্প্রতি একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড। দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের নিয়ে তৈরি সমীক্ষক দল প্রস্তাব দিয়েছেন, এবার থেকে তিনটির বদলে চারটি স্টাম্পের উইকেট হোক। এতে খেলায় যেমন নতুনত্ব আসবে, তেমনই বোলাররাও বাড়তি সুবিধে পাবেন। এই সঙ্গে সদ্য ক্রিজে নামা ব্যাটসম্যানের ক্ষেত্রে প্রথম বলটিকে 'ফ্রি-হিট' করে দেওয়ার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। এতদিন নো বলে ফ্রি-হিট দেওয়া হত। অর্থাৎ ব্যাটসম্যান খুশি মনে ব্যাট চালাতে পারতেন। আউটের আশঙ্কা থাকত না। এবার খেলতে এসে প্রথম বলটি ব্যাটসম্যান ফ্রি-হিট হিসেবে পাবেন। এ ছাড়া ক্রিকেটারদের পোশাকের ক্ষেত্রেও নতুন কিছু ভাবনার কথা শুনিয়েছেন তাঁরা।



নতুন মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার মেরি অ্যান

বাংলা থেকে প্রথম মহিলা জি এম হয়েছিলেন নিশা মেটা। এবার নিশার মতোই আরও এক মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার পেল বাংলা। খবরের শিরোনামে উঠে এলেন কলকাতার আর-এক দাবাড়ুকন্যা মেরি অ্যান গোমস। মুম্বইয়ে এশীয় জুনিয়র খেতাব জিতে নিয়েছেন তিনি। আর এর ফাঁকেই পেয়ে গিয়েছেন ডব্লিউ জি এম হওয়ার তৃতীয় নর্ম। প্রয়োজনীয় এলো রেটিং (২৩০০) পেয়ে মেরি অ্যান হয়েছেন বাংলার দ্বিতীয় ডব্লিউ জি এম। দিব্যেন্দু বড়ুয়ার চেস-অ্যাকাডেমির ছাত্রীটির লক্ষ্য এবার আরও উঁচুতে। অষ্টাদশী মেরি অ্যানের চোখে 'পুরুষদের গ্র্যান্ডমাস্টার' হওয়ার স্বপ্ন।

খেলা নিয়ে দারুণ মেলা

খেলা নিয়ে মেলা। যেখানে ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস, কবাডি, থ্রোবল, ক্যারাটের মতো নানা খেলার আয়োজন ছিল। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বসেছিল আন্তঃস্কুল মিনি অলিম্পিক ও একেবারে খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে শিশু অলিম্পিকের আসর। ১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে এই অভিনব মেলার আয়োজন করেছিল দক্ষিণ কলকাতা ক্রীড়া উন্নয়ন পর্ষদ। বর্ণাঢ্য পদযাত্রা দিয়ে শুরু হয় মেলা। পদযাত্রায় অংশ নেন খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক ও স্কুলের ছেলেমেয়েরা। চিনের বেজিং শহরে ২০০৮ সালে বসবে ২৯তম অলিম্পিকের আসর। বেজিং অলিম্পিক নিয়ে থিম প্যাভিলিয়ন এই মেলার আকর্ষণ বাড়িয়েছিল অনেকখানি।

চন্দন রুদ্র



এসে গেল...
মনজিনিস-এর
মজায় ভরা
Yummy কেক
আসল ভ্যানিলার মজা...
আসল স্ট্রবেরীর মজা...
monginis
Cream Delite
CREAM FILLED
Cream Delite
monginis
Jam Delite
Jam Delite
OFFBEAT COMMUNICATIONS/07
একমাত্র মনজিনিস-ই পারে এমন কেক নিয়ে আসতে। ক্রিম আর জ্যামে ভরা
filled cakes। ভারতে এই প্রথম। আসল ভ্যানিলা, দুধ আর মার্জারিনের
অনন্য স্বাদে ভরা...Cream Delite! বাছাই করা বেলজিয়ান স্ট্রবেরী জ্যামের
চমৎকার স্বাদে অতুলনীয়... Jam Delite! যতই খাও সাধ মেটে না কিছুতেই।
মজায় ভরা সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা। তোমাদের জন্য মাত্র ৫ টাকায়।
monginis
Manufactured by:
Dream Bake Private Limited
296, Kalu Khan Road, Boral,
24 Parganas,(S) WB.

ANANDAMELA JANUARY 2008 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2007-09
MM & PO/SSRM-KOL RMS/RNP-236/LPWP-051/2007-09 RNI NO.27057/75 INR 10.00

